ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদ যামান আমিরুশ শরীয়ত আলা হজরত
পীর আবুবকর সিদ্দিকী (দাদা হুজুর) রহঃ-এঁর অধ্যয়নস্থল
এবং নবাব আলিবর্দী খাঁ-এর আমলে
১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ভারতের তথা
পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ২৭৩ বছরের প্রাচীন

সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

(ফাজিল)

স্থাপিত ঃ ১৭৫১

ইক্বরা (প্রথম বর্ষ) ২০২৪

সীতাপুর, জগৎবল্লভপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১৪০৮

সংখ্যালঘু বৃত্তিমূলক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবকে সংবর্দ্ধনা

মাইনোরিটি স্কলারশিপের পরিদর্শনে মাননীয় জাঙ্গীপাড়া বি.ডি.ও সাহেব

নবনিযুক্ত পরিচালনা কমিটিকে সংবর্দ্ধনা

রাজ্যের ফাজিলে পঞ্চম ও নবম স্থানাধিকারীকে সংবর্দ্ধনা

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা

সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল প্রদান

রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্ররা

সূচিপত্র

১। সম্পাদকীয় কলমে ১
২। সহ সভাপতির কলমে - পীরজাদা মৌলানা মুহাম্মাদ তামিমুদ্দীন সিদ্দিকী ২
৩। সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার অতীত ও ঐতিহ্য - সেখ সেলিম ৩
৪। আধুনিকতার আলোকে সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা - সেখ আব্দুল আজীজ আল-আমান ৮
৫। অপরাহ্নের আলোয় রফিক - সুশান্ত ঘোড়ই (৬) পাখি - ইরানী খাতুন ১০
৭। দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় সুন্নাত ও দোওয়া - সেখ মসিয়ার রহমান ১১
৮। শেষ বিচার - মারিয়াম খাতুন (৯) সীতাপুর মাদ্রাসা - জুয়াইরিয়া সুলতানা লস্কর ১৩
১০। আজকের দিনে কম্পিউটার - সুস্মিতা পাল ১৪
১১। মাদ্রাসা শিক্ষা - সেখ আলিউল ইসলাম ১৬
১২। রোমন্থন - সুশান্ত ঘোড়ই (১৩) মা - আরিফা খাতুন ১৮
১৪। আধুনিকতার নিরীখে সৈয়দ আলাওল - রেবেকা খাতুন ১৯
১৫। কলম - তাসকিন তাবাস্‌সুম ২০
১৬। পড়াশোনা - আসিফ জামান শেখ (১৭) কলম তোমার শক্তি - হাজেরা খাতুন ২১
১৮। নারী শিক্ষার অবস্থা এবং বর্তমান ভারত - আয়েশা খাতুন ২২
১৯। আখলাকুলমুমিনিন (মু'মিনের চরিত্র) - মুহাম্মাদ উমার ফারুক মিদ্দা ২৩
২০। ম্যাগাজিন - অরিফ আনজুম মল্লিক (২১) কাতর প্রার্থনা - সোহানা পারভিন ২৪
২২। মাতৃত্ব - পরভীন সুলতানা ২৫
২৩। মরুর বুকে মুহাম্মাদ(সাঃ)-সরিফুল আমিন পিয়াদা (২৪) শুরু করো তুমি প্রভুর নামে -আসলাম ফারুক মল্লিক ২৭
২৫। ছাত্রছাত্রীদের জন্য করণীয় কাজ - সিরাজুল মল্লিক ২৮
২৬। Money - Arif Arman Mollick (২৭) শিক্ষকদের প্রতি - সামসুল আলম সরদার ৩০
২৮। শিক্ষক - মোঃ ইসমাইল মণ্ডল ৩০
২৯। ঈদের খুশি - ইয়াসমিনা খাতুন ৩১
৩০। সম্প্রীতি - নিশাত তাসনিম্‌ (৩১) চলো করি পরিবেশ রক্ষা - রূপসা খাতুন ৩২
৩২। মোবাইল - সেখ মিজানুর আলি (৩৩) নদীনালা গাছপালা - সওবিয়া তানঈম ৩৩
৩৪। পৃথিবী পরকালের কর্মক্ষেত্র - সেখ বাসির আলি ৩৪
৩৫। কাবার মওলা - সেখ রিফাজ আহমেদ (৩৬) একদিন - মহাম্মাদ সামিরুল মল্লিক ৩৬
৩৭। মাসজিদুল আক্বসার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট - এন্তাজুল ইসলাম রহমানী ৩৭
৩৮। নামাজ - সাবনাম খাতুন (৩৯) মায়ের জীবন সার্থক - ইমামা পারভিন ৪১
৪০। মোবাইল - রাইসা নুজহাত (৪১) আদর্শ শিক্ষক - সামসুন নাহার ৪২
৪২। সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য নেয়ামত ঃ পানি - সেখ আব্দুল আজিজ আল-আমান ৪৩
৪৩। পাখির ধর্ম - জায়দুল মল্লিক ৫৪

সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১। জনাব সেখ আব্দুল আজীজ আল-আমান সাহেব (এম.এস.সি রসায়ন), বি.এড, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
২। জনাব আলহাজ্ব সেখ মসিয়ার রহমান সাহেব (এম.এ ইংরাজী), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
৩। রেবেকা খাতুন (এম.এ বাংলা) এম.এড, এম. ফিল, সহঃ শিক্ষিকা
৪। জনাব নাজির হুসেন সাহেব (এম.এস.সি গণিত), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
৫। জনাব সেখ মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব (এম.এ ইংরাজী), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
৬। জনাব মাওঃ মোল্লা মোঃ ইসমাইল সাহেব (এম.এম), বি.এড, সহঃ শিক্ষক

৭। পরভীন সুলতানা (এম.এ বাংলা), বি.এড, সহঃ শিক্ষিকা
৮। জনাব মাওঃ মোঃ রমজান আলি মল্লিক সাহেব (এম.এম), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
৯। শ্রী সুশান্ত ঘোড়ই (এম.এস.সি গণিত) বি.এড, এম.ফিল, সহঃ শিক্ষক
১০। জনাব মাওঃ সেখ আলিউল ইসলাম সাহেব (কামিল অনার্স), এম.এ. আরবী, বি.এড, সহঃ শিক্ষক
১১। জনাব আলহাজ্ব মাওঃ মহঃ উমার ফারুক মিদ্দা সাহেব (এম.এম), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
১২। সেখ সেলিম সাহেব (ফাজিল), ডি.এল.এড, সহঃ শিক্ষক
১৩। জনাব মাওঃ সেখ আব্দুল আলী সাব্বীর সাহেব (এম.এম), বি.এড, সহঃ শিক্ষক
১৪। মোসাঃ মমতাজ বেগম (এম.এ বাংলা), ডি.এল.এড, পার্শ্ব শিক্ষিকা
১৫। শ্রীমতি সুস্মিতা পাল (এম.এ বাংলা), বি.এড, ডি.সি.এ (কম্পিউটার শিক্ষিকা)
১৬। জনাব আলহাজ্ব মাওঃ সিরাজুল মল্লিক সাহেব (এম.এম), বি.এড, ক্লার্ক
১৭। জনাব মহঃ আবু হুজাইফা সিদ্দিকী সাহেব (এইচ.এম) অফিস বেয়ারা

সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার কার্য্যকরী কমিটির সভ্যগণের নাম

১। জনাব সেখ জহিরুদ্দিন সাহেব (অভিভাবক প্রতিনিধি), সভাপতি
২। জনাব সাইফুদ্দিন মণ্ডল সাহেব (অভিভাবক প্রতিনিধি), সম্পাদক
৩। জনাব সেখ আব্দুল আজিজ আল-আমান সাহেব (ভাবপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক), যুগ্ম সম্পাদক
৪। অবর (জাঙ্গীপাড়া সার্কেল) বিভাগীয় প্রতিনিধি সদস্য
৫। জনাব আলহাজ্ব মাওঃ মহঃ তামিমুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব (পঞ্চায়েত সমিতি প্রতিনিধি), সহঃ সভাপতি
৬। জনাব সেখ মাফুজ রহমান সাহেব (অভিভাবক প্রতিনিধি), সদস্য
৭। জনাব সেখ আসমাউল সাহেব (অভিভাবক প্রতিনিধি), সদস্য
৮। জনাব সেখ আসরাফ আলি সাহেব (অভিভাবক প্রতিনিধি), সদস্য
৯। জনাবা মোসাঃ মর্জিনা বেগম সাহেবা (অভিভাবকা প্রতিনিধি), সদস্যা
১০। জনাব আলহাজ্ব সেখ মসিয়ার রহমান সাহেব (শিক্ষক প্রতিনিধি), সদস্য
১১। জনাব মাওঃ মোহঃ সেখ আলিউল ইসলাম সাহেব (শিক্ষক প্রতিনিধি), সদস্য
১২। জনাব মাওঃ সেখ আব্দুল আলী সাব্বীর সাহেব (শিক্ষক প্রতিনিধি), সদস্য
১৩। জনাব আলহাজ্ব মাওঃ সিরাজুল মল্লিক সাহেব (শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি), সদস্য

সম্পাদকীয় কলমে

আস্‌সালামো আলাইকুম,

বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইসলাম ধর্মের প্রথম আহ্বান ''পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'' (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয় তা'আলা এই বিশ্বসংসারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতির জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হল — ''ইক্বরা''। অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণ করা। তাই তিনি প্রথম নবী আদম (আঃ) কে ''বস্তু জগতের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিলেন'' (সূরাহ বাকারা' আয়াত ৩১)। পরে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষক মহানবী (সাঃ) এসে ঘোষণা করলেন — প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জ্ঞান অর্জনের অসংখ্য পথ খুলে দিয়েছেন।

''সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা'' নির্মিত হয়েছিল ১৭৫১ সালে। নবাবী আমলের পর ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হয়ে আধুনিকতার উত্তর পর্বে যখন বিশ্বায়নের প্রবল প্রতাপে আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরা ধ্বংসের মুখে তখনও ২৭৩ বছরের পুরাতন এই মাদ্রাসা একই সঙ্গে দ্বীনি' শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার উভয় দ্বার উন্মোচন করে জ্ঞান অন্বেষণ করে চলেছে। ২৭৩ বছরের প্রাচীন এই মাদ্রাসার অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি ইঁটের কোণায় কোণায়। আজ 'ইক্বরা'র মাধ্যমে হয়তো আগামী ইতিহাসের পথে একটি নতুন পালক সংযোজিত হল এই মাদ্রাসার মুকুটে। মাদ্রাসার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমস্ত কর্মীবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটি এবং অবশ্যই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ আব্দুল আজিজ আল আমান সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ''ইক্বরা'' আরো একটি সৃজনশীল জগতের জানালা খুলে দিল।

শিশুর প্রথম পা ফেলার মতোই আমাদের এই প্রথম প্রয়াসে স্বাভাবিক অনেক ভুল ত্রুটি ছড়িয়ে রয়েছে পত্রিকার প্রতিটি আনাচে-কানাচে। শ্রদ্ধেয় পাঠক মণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রথম প্রয়াস অবশ্যই মার্জনীয়। পত্রিকার প্রথমে রয়েছে মাননীয় শিক্ষক মহাশয় সেখ সেলিম সাহেবের মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা যেখানে তিনি মাদ্রাসার সুদীর্ঘ ২৭৩ বছরের সফল যাত্রা পথকে তথ্যের মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন। মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক চর্চায় ''ইক্বরা'' পরিপূর্ণতা পেয়েছে। আজ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর দীর্ঘ অপেক্ষা অবসান করে তাদের হাতে এবং বৃহত্তর পাঠক মণ্ডলীর সম্মুখে এই পত্রিকা পৌঁছে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। আশা করি এই সংখ্যাটি পাঠকের কাছে সসম্মানে একটি সংগ্রহ যোগ্যতা তৈরি করতে সমর্থ হবে এবং ভবিষ্যতে মাদ্রাসার সুদীর্ঘ ইতিহাসের ন্যায় ''ইক্বরা'' ও নতুন নতুন মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে ইনশা আল্লাহ।

সম্পাদকীয় কলমের পক্ষে —

জনাব আলহাজ্ মশিয়ার রহমান সাহেব , জনাব সেখ আব্দুল আজিজ আলমান সাহেব, জনাব সেখ সেলিম সাহেব, পরভীন সুলতানা, জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব, জনাব সেখ আব্দুল আলী সাব্বীর সাহেব

সহ-সভাপতির কলমে

পীরজাদা মৌলানা মুহাম্মাদ তামিমুদ্দীন সিদ্দিকী

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য এবং কোটি কোটি দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি। সমস্ত হামদ ও সানার পর আমি সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে মাদ্রাসার ম্যাগাজিন নিয়ে দু-চার কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন এবং মর্যাদামন্ডিত মাদ্রাসা যা নবাব আলীবর্দী খাঁ-এর আমলে ২৫৫৫ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদান করে ১৭৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের এই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের সার্বিক বিকাশে সর্বদাই অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে। ফলে আমরা যদি অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখি ২৭৩ বছরের বহু অগনিত ছাত্র-ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করেছেন। অবিভক্ত বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার বহু মনীষি এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন যারা সমাজ ও দেশ গঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছে। ইংরেজ আমলে দীর্ঘকাল এই মাদ্রাসা অনুবাদের জন্য (ফার্সী থেকে ইংরেজি বা বাংলা) বিখ্যাত ছিল। সর্বোপরি এই মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেছিলেন আমাদের পীর ও মোর্শেদ যুগ সংস্কারক মুজাদ্দেদুজ্জামান আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)। তাই যখনই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজীজ আল আমান সাহেব এই ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রস্তাব পেশ করেন আমি সঙ্গে সঙ্গেই অনুমোদন দিই।

কেননা আমি মনে করি আমাদের এই মাদ্রাসায় ম্যাগাজিনের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা যেমন বিকশিত হবে তেমনই অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য বিভিন্ন লেখকের দ্বারা জনসমাজে প্রস্ফুটিত হবে। এই ম্যাগাজিন জনসংযোগের বিরাট মাধ্যম হবে বলে মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে এই প্রাচীন মাদ্রাসার প্রসার ও প্রচার যতটুকু প্রয়োজন ছিল তা পায়নি বলেই মনে করি। এবং এই প্রাচীন মাদ্রাসার মর্যাদা রক্ষার্থে মাননীয় সরকার বাহাদুরের আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী বলে মনে করি। স্থানীয় এম.এল.এ এবং এম.পি-এর কাছে মাদ্রাসার একজন খাদেম হিসেবে আমার দাবি এই মাদ্রাসাকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন হিসেবে ঘোষণা করা। মাদ্রাসার কমিটি, মাদ্রাসা বোর্ডেরও উক্ত বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে তাই এর হোস্টেলকে নুন্যতম ১০০ আসনের করা উচিত বলে মনে করি।

যেহেতু প্রতিবছরই সীতাপুর মাদ্রাসা থেকে রাজ্য স্তরে র‍্যাঙ্ক করে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার জন্য র‍্যাঙ্ককৃত ছাত্রদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষন দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি সরকারের কাছে রইল। সর্বোপরি এই মূহুর্তে মাদ্রাসায় যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় মাদ্রাসার পঠন পাঠন খুবই ব্যাহত হচ্ছে তাই সরকারের কাছে অনুরোধ দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

পরিশেষে মাদ্রাসার সকল শুভাকাঙ্খি, শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মীবৃন্দ, ম্যানেজিং কমিটি ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসার ''ইক্করা'' ম্যাগাজিনটি সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ্ পাক ''ইক্করা'' ম্যাগাজিনকে কবুল করুন। আমীন!

সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার অতীত ও ঐতিহ্য ঃ-

সেখ সেলিম

শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এবং কোটি কোটি দরুদ ও সালামের নজরানা আমাদের নেতা নবী ও রসুল হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি। সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা যা আজ হতে ২৭৩ বছরের পুরানো। কিন্তু বাংলা ভাষায় উক্ত মাদ্রাসা নিয়ে কোন গবেষণা পত্র নেই। তাই অধম ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনা, বর্তমান ও অতীত মোতায়াল্লিদের ডকুমেন্ট ও মৌখিক বর্ণনা ও উক্ত মাদ্রাসার বিভিন্ন শিক্ষকদের বর্ণনা নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস পেয়েছি। উক্ত গবেষনায় বর্তমান মোতায়াল্লি ফরিদুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব (দাঃ বাঃ) এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋনী। আশাকরি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন এই মর্যাদাপূর্ণ মাদ্রাসার আরো অনেকেই গবেষনা প্রকাশ করে গৌরবপুর্ণ অধ্যায় গুলোর বিস্তারিত প্রকাশ করবেন ইনশা-আল্লাহ। আমি আরও কৃতজ্ঞ মাদ্রাসার বর্তমান টি. আই. সি. জনাব সেখ আব্দুল আজিজ আল-আমান মহাশয়ের কাছে যিনি মাদ্রাসার জন্য ম্যাগাজিন প্রকাশ করার বিশেষ উদ্যোগ না নিলে হয়তো আমার এই গবেষনা জনসমক্ষে প্রকাশই পেত না।

সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ঃ-

এই মাদ্রাসা কে, কবে এবং কেন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা সম্পর্কে যতটুকু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তা হলো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ‘‘George Toynbee” লিখিত ‘‘A sketch of the Administration of the Hooghly district from 1795 to 1845” বইটি। উক্ত বইয়ের ১১৯-১২০ পৃষ্ঠা অনুযায়ী মাওলানা মাসাউদ্দিন (রহঃ) এবং মাওলানা আমসাউদ্দিন (রহঃ) যারা দুইভাই ছিলেন তাদেরকে নবাব আলিবর্দী খাঁন মোতায়াল্লি ঘোষনা করে সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মূলতঃ কোন সালে উক্ত মাদ্রাসা গঠিত হয় তা উক্ত বইটিতে স্পষ্ট নয়। উক্ত বইটিতে এটা স্পষ্ট যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী থেকে বাংলার গর্ভমেন্ট কার্টিয়ার এর আমলে উক্ত ইন্ডাওমেন্টের জন্য ২৫৫৫ বিঘা সম্পত্তি ইংরেজ সরকার ব্যবহার করবে এবং পরিবর্তে সরকার ১৫৮ টাকা মাসিক গ্রান্ট প্রদান করবেন। এটা থেকে স্পষ্ট যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারির পূর্বেই উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

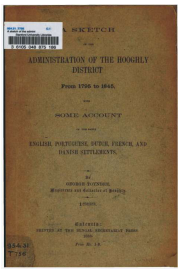

১৭৫১ সালে সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট এ্যন্ড মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা আমরা বেশ কয়েকটি মাধ্যম থেকে জানতে পারি —

প্রথমত ঃ- ১৯১৬ সালে তৎকালিন মোতায়াল্লি মাওলানা আব্দুল হক (রহঃ) ইংরেজ শাসিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। তা হতে বোঝা যায় নবাব আলিবর্দী খাঁনের আমলেই উক্ত মাদ্রাসার সাথে সীতাপুর হোস্টেল, লাইব্রেরী, মুসাফিরখানা এবং মসজিদ পরিচালনা শুরু হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ- Twocireles. Net নামীয় Online একটি ম্যাগাজিন যেখানে বর্তমান মোতায়াল্লি

জনাব আবু নাঈম সিদ্দিকী সাহেব ২০১২ সালের ৩রা মে তাঁর সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নবাবী আমলের ৪০ ফুট একটি দলীল প্রদর্শন করেন যা ''Rent for 2555 bigha waqf land in Kolkata, WB govt. paid only Rs. 159/month'' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

Abu Nayeem Siddiqui with the 40 feet long deed of land gifted to him by Nawab Ali Vardi Khan.

তৃতীয়ত ঃ- জনাব আবুল বরাকত (রহঃ) যিনি ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মোতায়াল্লি ছিলেন তাঁর একটি লেটারপ্যাড যেটা বর্তমান মোতায়াল্লি জনাব ফরিদুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের কাছে গচ্ছিত রয়েছে তাতে লেখা রয়েছে ''The Sitapur Endowment Mosque'' (founded during the Reign of Nawab Alivardi Khan of Bengal in 1751) এথেকে বোঝা যায় নবাব আলিবর্দী খাঁন (1740-1756) খ্রিঃ সময়কালের মধ্যেই ১৭৫১ সালে উক্ত ইন্ডাওমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

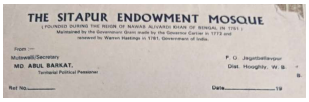
THE SITAPUR ENDOWMENT MOSQUE

চতুর্থত ঃ- সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট এ্যন্ড মাদ্রাসার মোতায়াল্লীগনের দলীল যা পরস্পরভাবে বংশ পরম্পরায় ব্রিটিশ এবং স্বাধীন ভারতের সরকারী ডকুমেন্ট। যদিও সমস্ত দলিল না পাওয়া গেলেও মাওলানা খেজের, মাওলানা আব্দুল হক, মাওলানা খেবির প্রমুখ মোতায়াল্লিদের দলীল বর্তমান মোতায়ল্লিদের কাছে রয়েছে।

এ সমস্ত দলীল প্রমানের মাধ্যমে একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলেই 'সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট এ্যান্ড মাদ্রাসা' নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল। তবে সেটা ১৭৫১ সালেই প্রতিষ্ঠিত তা একমাত্র জনাব আবুল বারকাত (রহঃ) এর মোতায়াল্লি থাকা কালীন মসজিদের লেটার প্যাড থেকেই জানা যায়। তবে ''George Toynbee'' বই অনুসারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৭৭২ সালে ২৬শে জানুয়ারির আগেই এ প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ মাদ্রাসা, মসজিদ, হোস্টেল, মুসাফিরখানা প্রভৃতি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নবাব ২৫৫৫ বিঘা ওয়াক্ফ সম্পত্তি মৌলানা মাসাউদ্দিন (রহঃ) এবং মাওলানা আমসাউদ্দিন (রহঃ) কে যৌথভাবে মোতায়াল্লি করা হয়েছিল একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

উক্ত প্রমাণাদির দ্বারা একথা প্রতিভাত হয় যে, নবাব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই উক্ত ইন্ডাওমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কাছে অনুমান নির্ভরতা ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র যদি নবাবী আমলের প্রথম দলীল যা মাওলানা মাসাউদ্দিন (রহঃ) এবং আমসাউদ্দীন (রহঃ) কে প্রদান করেছিলেন তাতে কিছু উল্লেখ থাকতে পারে। তবে একথা সহজেই অনুমেয় যে, ২৫৫৫ বিঘা সম্পত্তি একটা কোন উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই হতে পারে না। তাই নিম্নে কিছু কারণ অনুমান করতে পারি ঃ-

রাজনৈতিক কারণ ঃ- নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে সীতাপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানগুলো বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল। আর র্ধমানের রাজা 'তেজ চাঁদ' এই এলাকাগুলো স্বায়ত্ব শাসন করতো। তাই নবাব আলিবর্দী খাঁ যখন রাজা তেজ চাঁদকে পরাজিত করলেন তখন নবাব এই অঞ্চলগুলোতে নিজস্ব লোক দ্বারা শাসনকার্য পরিচানলার স্বার্থে কিছু শিক্ষিত স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন পড়ে যারা আরবী থেকে ফার্সী বা বাংলা থেকে ফার্সীতে অনুবাদ করবেন। এই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেও লক্ষ্য করি। ১৭৭৪ সালের ২রা জুন ওয়ারেন হেস্টিংস যে চিঠি তৎকালীন মোতায়াল্লী মাওলানা মাসাউদ্দীনকে লিখেছিলেন যেটা ''George Toynbee'' তার বইয়ের পুরো চিঠিটাই ছেপেছেন, তাতে আরবী হতে ফার্সী অনুবাদ বিভাগ যে পূর্ব হতেই চলেছিল তার আভাস পাওয়া যায়। এছাড়াও উক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ করার মাধ্যমে নবাবের জন সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষ্য হতে পারে।

সামাজিক কারণ ঃ- ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বাংলায় যে মুসলমান সমাজ বসবাস করতো তারা হয় যুদ্ধের প্রয়োজনে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছে নয়তো তারা ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তর হয়েছেন। কিন্তু তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বহু দূর দূরান্তে গমন করে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করতো। পরবর্তীতে ১০০০ বছরে বাংলায় সেভাবে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই স্থানীয় মানুষের দাবী পূরণের জন্যও এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। আর এই অনুমানকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে "J.A. Taylor" এর রিপোর্ট যিনি Assistant Inspector of public instruction, for Mohammadan of Burdwan in Bengal এর Inspector ছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বশরীরে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও উন্নতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন এবং এখানকার সামাজিক চাহিদাও তৎকালীন রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

ধর্মীয় কারণ ঃ- নবাব আলিবর্দি খাঁ-এর আমলে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় কারণেও হতে পারে। সেই কারণেই হয়তো এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ২৫৫৫ বিঘা সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। উক্ত সম্পত্তি হতে আয়ের মাধ্যমে ইন্ডাওমেন্টের সমস্ত বিভাগ মাদ্রাসার সমস্ত খরচ, মসজিদের খরচ, লাইব্রেরীর খরচ, মুসাফির খানার খরচ, হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রদের ভরণ পোষন, মোতায়াল্লীর পরিবারের ভরণ পোষন প্রভৃতি খরচ নবাবি আমল হতেই চালু রয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় শিক্ষা মূলতঃ আরবী ভাষার উপরই নির্ভর করে তাই কোরআন, তাফসীর, আরবী গ্রামার, ফেকাহ, ফারায়েজ, উসুল প্রভৃতি কেতাবাদির সাথে গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের মতো বিষয় আরবী ফার্সী মাধ্যমে পড়ার সুযোগ হয়। আমরা যদি মোতায়াল্লীগণের নামের তালিকা দেখি তাহলে দেখবো সকলেই তৎকালীন শীর্ষ স্থানীয় আলিম ছিলেন। তাই এই প্রতিষ্ঠান তৈরীতে ধর্মীয় গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট ও মাদ্রাসার বিবর্তন ঃ- সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট মূলতঃ মাদ্রাসা, মসজিদ, মুসাফিরখানা, লাইব্রেরী, হোস্টেল এবং মোতায়াল্লী গনের সাংসারিক ভরণ পোষনের জন্যই তৈরী হয়েছিল। ১৭৫১ সালে গঠিত হলেও ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ এর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিবর্তন শুরু হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত গভর্নর কার্টিয়ার সর্বপ্রথম ১৭৭২ সালে মাওলানা আমাসাউদ্দিন ও মাওলানা মাসাউদ্দিন (রহঃ) এর সঙ্গে ইন্ডাওমেন্টের বিপুল সম্পত্তি ব্যবহারের পরিবর্তে মাসিক ১৫৮ টাকা প্রদানের চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই চুক্তি পূনঃনবীকরণ করেন। এবং সরকারি ট্রেজারি থেকেই এই গ্রান্টের টাকা প্রদান করা হতো। ১৮১২ সালে তৎকালিন শাসক ১/৩ অংশ মোতায়াল্লি এবং ২/৩ অংশ সীতাপুর ইন্ডাওমেন্টের জন্য নির্দ্ধারন করেন। ১৮৩৯ সালে ইংরেজ সরকার নিজেরাই উক্ত মাদ্রাসা পরিচালনার উদ্যোগ নিলে তৎকালিন মোতায়াল্লী মুহাম্মদ আলী হাফিজ (রহঃ) সরকারের কাছে আবেদন করেন মুতায়াল্লিদের ক্ষমতা খর্ব না করার জন্য। উক্ত দাবী তৎকালিন বাংলার গভর্নর তা মেনে নেন। ১৮৭২ সালে এই ইন্ডাওমেন্ট পরিচালনার জন্য মোতায়াল্লির সঙ্গে হুগলী জেলার ক্যালেক্টারকে সংযুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করেন, তৎকালীন বাংলার গভর্নর ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রফেসর Blochman-এর সুপারিশে ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রস্তাবিত সিলেবাসে পঠন পাঠনের অনুমোদন হয়। ১৯১৩ সালে মোতায়াল্লী মাওলানা আব্দুল হক (রঃ)-এর আমলে তৎকালীন কালেক্টরের পরামর্শে জুনিয়র মাদ্রাসার পাঠক্রম গ্রহন করা হয়। এবং ১৯৬৪ সালে ভারত স্বাধীনের পর মোতায়াল্লী মাওলানা আবুল বারাকাত (রহঃ) এর উদ্যোগে এবং মাওলানা আবুল ফারাহ সিদ্দিকী (রহঃ) পরামর্শে ও সহযোগিতায়

সিনিয়র মাদ্রাসায় (আলিম) রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ফাযিল তথা উচ্চমাধ্যমিক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড Affiliation দেন।

সীতাপুর মসজিদ ঃ- সীতাপুর মসজিদ ১৭৫১ সালের পুর্বে এই মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁন নয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি পূনঃনির্মান করেন এবং মাওলানা মাসাউদ্দীন (রহঃ) মাওলানা আমাসাউদ্দীন (রহঃ) কে মোতায়াল্লি করে মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। ঐ মসজিদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ২৫৫৫ বিঘা সম্পত্তি থেকেই আজও পরিচালিত হয়ে আসছে।

সীতাপুর হোস্টেল ঃ- নবাব আলীবর্দি খাঁ-এর আমল থেকেই সীতাপুর হোস্টেল পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই ১৭৫১ সালেই হোস্টেল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উক্ত হোস্টেল হতে ২৭৩ বছরে হাজার হাজার ছাত্র বিনা খরচে অর্থাৎ থাকা, খাওয়া কিতাবাদি সহ সমস্ত কিছুই ফ্রিতে পেয়ে আসছে। যদিও বর্তমানে মোতায়াল্লি গ্রান্ট বন্ধ থাকায় নাম মাত্র খরচ ছাত্রদের থেকে নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে প্রায় ১০০ জন ছাত্র রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার ছেলেই উক্ত হোস্টেলে থেকে শিক্ষাগ্রহন করে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক ৫০ আসনের একটি নতুন ভবন নির্মাণ করেছে। সীতাপুর হোস্টেলের ছাত্রদের থাকা খাওয়া শিক্ষকদের সুবিধা থাকায় বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে আসছে।

নাসরুল উলুম ফান্ড ঃ- নাসরুল উলুম ফান্ড গঠিত হয় ১৯৭৬ সালের জুন মাসে। এই ফান্ড মূলতঃ গঠিত হয় ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদুজ্জামান হজরত মৌলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এঁর ছোট সাহেবজাদা হজরত পীর মৌলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলি (রহঃ) এঁর উদ্যোগে। ১৯৭৬ সালের পূর্বে হজরত মৌলানা মুহাম্মাদ মুজাফফার (রহঃ) ইন্তেকাল করার পর ওয়াকফ বোর্ডে মোতায়াল্লী নিযুক্তির পদ্ধতিগত দেরী হওয়ার ফলে ২৫৫৫ বিঘা জায়গার পরিবর্তে প্রাপ্ত টাকা আটকে যায়। ফলে হোস্টেল চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় হোস্টেল ছাত্রশূন্য হয়ে ওঠে। সেই সময় ফুরফুরা শরীফে ছোট হুজুর (পীর জুলফিকার আলি সিদ্দিকী) (রহঃ) বিচক্ষণতার সাথে নিজ উদ্যোগে এগিয়ে এসে বলেন ''আমার আব্বাজান পীর আবুবকর সিদ্দিকী (দাদাহুজুর পীর কেবলা) (রহঃ) সাহেব এখানে পড়াশোনা করেছেন তাই এই হোস্টেলে অচলাবস্থা চলতে পারে না''। তিনি নিজে পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামগুলোতে (কামদেবপুর, কোতলপুর, বারাসাত, বুজরুক, প্রসাদপুর, বাহানা, ধীতপুর, তেলিহাটি পাঁচবেড়িয়া, শ্যাওড়াবেড়িয়া, লক্ষণপুর, মুন্ডালিকা কোদালপুর, তোড়লপুর, চাঁচুয়া, বন্দর, চাঁকপুর, ইছানগরী, কমলাপুর, সুফী জঙ্গল, বোড়হল, সাতঘড়া, দিঘির পাড়, আইমাচক, জগন্নাথপুর) ধান চাল সহ অন্যান্য ফসলাদি এই হোস্টেলে দান করতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেন। মোতায়াল্লী জনাব আবুল বারাকাত সাহেব ও ছোটো হুজুর পীর জুলফিকার আল্লি সিদ্দিকী কেবলার নির্দেশে একটি কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটির সভাপতি পীর জুলফিকার আলি সিদ্দিকী (রহঃ) কে মনোনীত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি আমৃত্যু সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন । উক্ত কমিটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিকট এককালীন দান, জাকাত, ফেতরা, সদকা প্রভৃতি আদায় করে গরীব অসহায়, এতিম, মিসকীন ছাত্রদের নিঃখরচে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করা হয়। পীর জুলফিকার সিদ্দিকী (রহঃ) এঁর ইন্তেকালের পর উনার বড়ো সাহেবজাদা হজরত পীর মৌলানা মুহাম্মাদ কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী (রহঃ) কে সভাপতি করা হয়। পীর মুহাম্মাদ কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর ওনারই মেজো সাহেবজাদা পীর মৌলানা মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব বর্তমানে সভাপতি

হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

লাইব্রেরী ঃ- সীতাপুর লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মূলতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের পঠন পাঠনের সুবিধার্থে। কিন্তু পরে এই লাইব্রেরী জ্ঞান অনুসন্ধান কারীদের জন্য বিশেষ মাধ্যম হয়ে ওঠে। জনাব ফরিদুদ্দিন সিদ্দিকী (দাঃবাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি, আমাদের লাইব্রেরীতে ইঞ্জিল শরীফও ছিল। বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন নিজ উদ্যোগে কিতাব দান করতেন তেমনই মোতায়াল্লী ও শিক্ষকগণও পাঠদানের সুবিধার্থে বহু দুর্মুল্য কিতাব সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে এই লাইব্রেরী চালু রয়েছে তবে সঠিক রক্ষনাবেক্ষন এবং পরিচর্যার অভাবে বহু কিতাব নষ্ট হয়েছে।

মুসাফিরখানা ঃ- মুসাফিরখানাটি সাধারণতঃ হোস্টেলের ছাত্রদের অভিভাবক এবং সরকারী কর্মী, প্রাক্তন ছাত্রদের জন্যই চালু ছিল। বর্তমানে এই মুসাফির খানা হোস্টেলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

মোতায়াল্লিগণ ঃ- মাওলানা মাসাউদ্দিন (রহঃ) ও মাওলানা আমসাউদ্দিন (রহঃ) ছিলেন প্রথম সংযুক্ত মোতায়াল্লী। মোতায়াল্লী দলীল অনুযায়ী উক্ত দুই মাওলানার সমস্ত পুরুষ বংশধর যৌথভাবে মোতায়াল্লি। যদি কোন উত্তরাধিকারীর পুরুষ সন্তান না থাকে তবে তাঁর কন্যাসন্তানও মোতায়াল্লি হতে পারে। সর্বশেষ কার্যকারি মোতায়াল্লি মাওলানা আবুল বরাকাত (হঃ) ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে ভাই মহম্মদ সেগির, বড় ছেলে মহম্মদ ফরিদুদ্দীন, মেজ ছেলে আবু নাঈম, ছোট ছেলে আবু হোরায়রা ১৯৯৯ সালেই সংযুক্ত মোতায়াল্লী হিসেবে চিঠি পান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবু নাঈম সাহেবের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের মোতায়াল্লি পদকে ওয়াকফ বোর্ড বাতিল করে। যেটা নিয়ে এখনও ওয়াকফ বোর্ড এবং কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে।

সীতাপুর মাদ্রাসার বিখ্যাত ছাত্রগণ ঃ- সীতাপুর মাদ্রাসা ২৭৩ বছরে অগনিত ছাত্র পশ্চিমবঙ্গকে উপহার দিয়েছে। যাঁরা নিজ নিজ প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা মনিষী ও যুগ সংস্কারক ফুরফুরা শরীফের পীর মাওলানা মোজাদ্দেদ আবু বকর সিদ্দিকী রহঃ তার প্রাথমিক শিক্ষা সীতাপুর মাদ্রাসা হতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তেমনই মাওলানা আব্দুল হক (রহঃ) যিনি পরবর্তীতে এই মাদ্রাসার মোতায়াল্লী ও ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব (রহঃ) এর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন। তিনি এই মাদ্রাসার হেড মোদার্রেস ও ইংরেজ আমলে অনুবাদকের কাজও করেছেন। এই মাদ্রাসার বহু ছাত্রই সীতাপুর মাদ্রাসার হেড মোদার্রেস হয়েছিলেন, মাওলানা আব্দুল লতিফ, মাওলানা আবুল কাসেম সিদ্দিকী, মাওলানা আবুল ফারাহ সিদ্দিকির (রহঃ) দের মতো বিখ্যাত ছাত্রদের সকলের নাম এই ছোট্ট লেখায় খুবই কঠিন কাজগুলোর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত।

পরিশেষে বলবো উক্ত ইন্ডাওমেন্টের মধ্যে মসজীদ এবং মাদ্রাসা বিশাল স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে মাদ্রাসার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিবর্তন, তার কার্যক্রম এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে গবেষনা করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। আমি আশা করবো জ্ঞান পিপাসু অনুসন্ধিৎসু মানুষরা এগিয়ে এসে আরো গবেষনা করে সীতাপুর এন্ডাওমেন্টের ২৭৩ বছরের সুবিশাল অতীতকে আগামী প্রজন্মের জন্য উপহার দেবেন ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ পাক 'ইক্বরা' ম্যাগাজিনটিকে (যেটা প্রকাশিত না হলে এই ইতিহাস জনসমক্ষে আসতো না) কবুল করুন এবং আমার এই ক্ষুদ্র কাজের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষমা করুন। আমীন!

আধুনিকতার আলোকে সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

সেখ আব্দুল আজিজ আল-আমান (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)
সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

অতীতকে অস্বীকার করে সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুদীর্ঘ ২৭৩ বছর পূর্বে নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে ১৭৫১ সালে যে মাদ্রাসার বীজ বপিত হয়েছিল সীতাপুরের মাটিতে তা আজ ফুলে ফলে বিকশিত। একইসঙ্গে জীবনের বৃহত্তর পেক্ষাপটে ঐতিহ্য ও বর্তমানকে ধরে রেখেছে । মাথার উপর দিয়ে অজস্র ঝড় বয়ে গেলেও নবাবী আমলের চিহ্ন বুকে নিয়ে সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা আজও স্বমহিমায় সমুজ্জল। প্রতিবছর আলিম ও ফাজিল এর বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল তার প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা শিশু থেকে ফাজিল পর্যন্ত ইন্টিগ্রেটেড কোর্স বা সমন্বিত ধারায় পড়াশোনা হয়। এমনকি ফুরফুরা শরীফ এর দাদা হুজুর পীর মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক (রহঃ) এই মাদ্রাসায় বাল্যকালে শিক্ষা লাভ করেছিলেন যা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। শুধু তাই নয় বহু রাজ্যের অনেক পন্ডিত ব্যক্তিগণের অধ্যাপনার স্থান এই সিনিয়র মাদ্রাসাটি। তাঁদের কর্ষিত শস্যের অভ্যন্তরে যে ঐশ্বর্যের বিকাশ ঘটেছিল তার ফল স্বরূপ বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বারোশরও বেশি।

চারদিক ঘেরা সুবিন্যস্ত এই মাদ্রাসাটি ত্রিতল বিশিষ্ট। মোট আটাশটি রুম রয়েছে; যার মধ্যে ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা হয় ১৩টি রুম। অফিসের কাজে ব্যবহার করা হয় তিনটি রুমকে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি কম্পিউটার রুমে তাদের কম্পিউটার শেখানো হয়। মাদ্রাসায় মোট ১৩টি কম্পিউটার বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রজেক্টরের সাহায্যেও ক্লাস নেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিলের জন্য ডাইনিং রুম এবং একটি লাইব্রেরী রুম রাখা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন জিনিসপত্র থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ল্যাবরুমের সুবিধা না থাকার জন্য প্রভূত সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির মতোই সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রছাত্রী সরকারি পরিষেবা গুলি সময়মতো পেয়ে থাকে। যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের বই, ড্রেস, জুতো, ব্যাগ, খাতা, মিড ডে মিল, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, ট্যাব, মাইনরিটি স্কলারশিপ, ওষুধ প্রভৃতি। এর ফলে মাদ্রাসার ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রী প্রায় শূণ্য। বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ১৩ জন। এছাড়া দুজন অশিক্ষক কর্মী, একজন কম্পিউটার শিক্ষিকা ও একজন প্রাইমারি পার্শ্ব শিক্ষিকা শিক্ষকতা করছেন। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি নলকূপ, তিনটি সাবমার্সিবল, জল শোধন ব্যবস্থা সহ ছাত্রীদের সুবিধার্থে ভেন্ডিং মেশিনের মত নানা আধুনিক ব্যবস্থা আছে এই সর্বাধিক প্রাচীন মাদ্রাসায়।

নূতন আলোকে সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার কথা বললে অবশ্যই আসে সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসার হোস্টেলের কথা। নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলেই একইসঙ্গে হোস্টেলটিও গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৬ সালে ফুরফুরা শরীফের ছোট হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এর সভাপতিত্বে ''নাসরুল উলুম ফান্ড'' গঠিত হয়। প্রায় শতাধিক ছাত্রদের ভরণ পোষণের দায়িত্বে আছে ফান্ডটি। যেখানে অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় দান করে থাকেন এবং দানের ওপর ভর করে এই ফান্ড দীর্ঘদিন ধরে চলছে। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে সরকারের

বিশেষ অনুদানে আরেকটি নতুন হোস্টেল বিল্ডিং গড়ে ওঠে যা অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন। সিসি ক্যামেরার আয়ত্তাধীন মোট ১১০ জন ছাত্র থাকার সুবিধা হস্টেলটিতে রয়েছে। এর মধ্যে ৫০ জন ছাত্রের খাবার জন্য এক হাজার টাকা করে সরকার দিয়ে থাকেন। এছাড়া খুব কম মূল্যে চালও দেওয়া হয়। সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে ছাত্র জীবন গড়ে তোলা হয় ফলে মাদ্রাসার আলিম ফাজিল এবং অন্যান্য ক্লাসের বাৎসরিক ফলাফল খুব ভালো হয়। বোর্ডের পরীক্ষার পাশের হার প্রতি বছর ৯৮ থেকে ৯৯ শতাংশ হয়ে থাকে।

অতীতের গৌরবোজ্জল দীর্ঘ ইতিহাস বহনকারী এই মাদ্রাসাটি উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছে গেলেও তা রয়ে গেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে। এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ''সবচেয়ে প্রাচীন'' — এই তকমাটি ও মাদ্রাসার কপালে জোটেনি। বর্তমানের বিজ্ঞাপনের যুগে এই মাদ্রাসাটি এখনো পর্যন্ত প্রচার বিমুখ হয়ে থাকার কারণে মানুষের জানার বাইরে। আর এই কারণেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন মাদ্রাসা বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট খেলার মাঠ নেই; যা প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকা দরকার। মাঠ না থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে একটা বড় অন্তরায়। সবুজ সাথী সাইকেল থাকলেও তা রাখার জন্য সেড নেই, আধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হলেও মাদ্রাসায় সিসি ক্যামেরা নেই, এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয়ে গেলে অন্ধকারে ক্লাস করতে হয় জেনারেটার নেই; ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উভয়কে সমস্যায় পরতে হয়। মাদ্রাসাটি জগৎবল্লভপুর থেকে জাঙ্গীপাড়া যাওয়ার মেইনরোডের ওপর অবস্থিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের বিপদের আশঙ্কা সব সময় থাকে। প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারের জন্য বাথরুম থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত সামান্য। ছাত্রদের নামাজের জন্য মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় মসজিদ থাকলেও ছাত্রীদের নামাজ ঘরের অভাব। বহু প্রাচীন নথি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট লাইব্রেরিয়ান না থাকার জন্য। তাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন —

- **ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলার মাঠ,**
- **সাইকেল রাখার জায়গা,**
- **সিসি ক্যামেরা,**
- **মাদ্রাসার ভেতরের অংশ ঢালাই-এর ব্যবস্থা,**
- **সাউন্ডলেস জেনারেটর,**
- **একাধিক বাথরুম,**
- **পথনিরাপত্তা,**
- **আধুনিক ল্যাব রুম,**
- **লাইব্রেরিয়ান,**
- **ইনডোর স্পোর্টস রুম,**
- **অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা কেন্দ্র ও অডিও ভিজুয়াল সহ একটি স্মার্ট ক্লাসরুম ।**

উক্ত সমস্যা গুলির সমাধানে সরকার এগিয়ে এলে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব প্রাচীন এই মাদ্রাসাটি ভবিষ্যতে নিজের ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার নবরূপটিকেও আত্মস্থ করে এগিয়ে যাবে অন্বিষ্টের সন্ধানে ইনশা আল্লাহ।

অপরাহ্নের আলোয় রফিক

সুশান্ত ঘোড়ই
শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

পিঠে বই ভর্তি ব্যাগটা সজোরে টেনে নিয়ে রফিক বলল, আসলাম মা। এবার রফিকের ফাইনাল পরীক্ষা। এইবারে সে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। লাগাম ছাড়া একটা ভিড় বাসে কোনোমতে দেহটাকে বাসের মধ্যে ঢুকিয়ে সে স্কুলের পথে রওনা হল। স্কুলে নেমে বাকি বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতা খোস মেজাজের গল্প ওদের রোজকার ঘটনা। যেমন কিছু ছেলে থাকে রোজ আসে আর যায়, তেমনই একজন।

এবার বিদ্যালয় থেকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়ার দিন ঘোষণা হল। তারপর থেকে রফিকটা কেমন পাল্টে গেল। বদলে গেল ওর নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার। ছেলেটা পড়াশুনাতে খারাপ হলেও খেলা এবং অনুষ্ঠানের কাজকর্মে খুবই পটু। একবার তো ও ফুটবল খেলাতে রাজ্য পর্যন্ত যায়। অনুষ্ঠানের দিনেও রফিককে দেখলাম শতরঞ্জিটা বিছিয়ে দিল, মাইক্রোফোনটা সেট করলো, কয়েকটা জলের বোতল আর দুটো খাতা নিয়ে আসার পর একেবারেই কোণে গিয়ে বসল। পরে দেখি ছলোছলো চোখ, হৃদস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানের পর সবাই যখন একে একে প্রনাম সেরে নিচ্ছে, রফিকও এগিয়ে আসলো। অনভ্যস্ত হাতে প্রণাম সেরে আমাকে চুপিচুপি বলল পরীক্ষায় ফেল করলে আবার এই স্কুলে থাকবো স্যার?

কেন রে ফেল করবি কেন? ভালো করে পড়াশোনা করলে ঠিক পাস করে যাবি। আজকাল প্রশ্ন সোজা থাকে, ঠিক পাস করে যাবি। না..... মানে স্যার..... আমতা আমতা করে রফিক বলল, পাস করে গেলে তো স্কুলে থাকতে পারবো না, আর আপনার সাথে দেখা হবে না, মনে আছে স্যার সেইবার আপনি আমাকে একটা ভালো জুতো কিনে দিয়েছিলেন খেলার জন্য।

তাতে কি হয়েছে?

আমি আজও ভুলিনি স্যার।

তার জন্য কি পরীক্ষা দিবি না, ফেল করবি?

ফেল করলে স্কুলের মান সম্মান, আমাদের মান সম্মান নষ্ট হবে না, হবে তো?

তা তো হবে, কিন্তু আমি তো আর স্কুলে এসে আপনার সাথে দেখা করতে পারব না।

ওরে পাগল সব পারবি, যখন খুশি আসবি। স্যার আপনারা তো সব ভুলে যান। যারা ভালো পড়াশোনা করে তাদের মনে রাখেন, আমাদের রাখেন না।

সব মনে থাকে তো, কিছু জন থাকে ভালো ছাত্র হিসাবে আর কিছু জন থাকে ভালো ছেলে হিসাবে।

পাখি

ইরানী খাতুন
ষষ্ঠ শ্রেণী

ছোট্ট পাখি, ছোট্ট পাখি,
মিষ্টি সে এক পাখি।
ছোট্ট দুটি ডানা তাহার
ছোট্ট দুটি আঁখি।।

থাকত সে এক ছোট্ট খাঁচায়,
আমার ঘরের কোণে,
এক দিন সে হঠাৎ করে....
কোথায় গেল চলে।।

ফিরল না সে আর কোন দিন,
তার সেই খাঁচাটিতে,
শূন্য খাঁচা থাকল পড়ে,
আমার ঘরটিতে।।

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় সুন্নাত ও দোওয়া

সেখ মসিয়ার রহমান সাহেব

শিক্ষক - সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত কালামুল্লাহ শরীফে ঘোষনা করেছেন -''আমি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য।'' ইবাদত কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব জাকাত, কলমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ পাকের হুকুমকে আল্লাহর হাবীব (সঃ) এর পদ্ধতিতে পালন করলেই ইবাদত বলে গন্য হবে। ঘুম থেকে উঠা আবার উঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত দৈনন্দিন প্রতিটি কাজই ইবাদত হবে। যদি নবী (সঃ) এর সুন্নত পদ্ধতিতে করা হয় তাই হবে ইবাদাত।

এই ক্ষুদ্র লেখনিতে দৈনন্দিন জীবনের সুন্নত অনুসারে আমল ও দোওয়ার উল্লেখ করছি।

ঃ- সারাদিনের ছোট ছোট আমল ঃ-

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সুন্নতি আমল ঃ- ঘুম থেকে উঠলে সুন্নতি আমল হল দোওয়া পড়ে নেওয়া -

১। (আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর)।

২। (সুবহানাল্লহি ওয়াল্ হামদুল্লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)।

৩। (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্ইন কদীর।)

৪। (রব্বিগ্ ফির্লী) ৩ বার।

এছাড়া যে কোন দোওয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন।

প্রস্রাব পায়খানা সুন্নতি আমল ঃ- প্রস্রাব পায়খানায় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও ডান পা দিয়ে বের হওয়া। প্রবেশের সময় পাঠ করার দোওয়া হল- (বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়ালা খাবায়িছ।) অর্থ ঃ 'আল্লাহর নামে (শুরু করছি); হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট তথা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।'

প্রস্রাব পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দোওয়া (গোফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানি।) অর্থ : '(হে আল্লাহ!) আপনার কাছে ক্ষমা চাই। সব প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য; যিনি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিস থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।'

জামা ও জুতা পরিধানের সুন্নতি আমল ঃ- বিসমিল্লাহ বলে বাম পা থেকে জুতা খোলা ও ডান পা দিয়ে জুতা পরিধান করা। অনুরূপ ভাবে বিসমিল্লাহ বলে পোশাক ডান দিক থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা। তাছাড়া যে কোন কাজ শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া।

বাড়িতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুন্নতি আমল ঃ- সালামসহ বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা বাম পা দিয়ে বের হওয়া। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কালতু আল্লিহি লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। বাজারে বা লোকালয়ে গেলে পঠিত দোওয়া হল - (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদির।)

ফযিলত ঃ- দশলক্ষ নেকী দেওয়া হবে ও শয়তান থেকে হেফাযত হবে।

কোন জায়গায় অবস্থানের সুন্নতি আমল ঃ- কোন জায়গায় অবস্থান করলে (আউযু বিল্লাহি কালিমাতিত্ তান্মাতি মিন শাররে মাখলাক) পাঠ করে দেওয়া।

ফযিলত ঃ- তাহলে আল্লাহ সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

বাড়িতে ফিরে মেশওয়াক করা। বাড়িতে থাকাকালীন বাড়ির সদস্যদের নিয়ে দ্বীনি আলোচনা করা। সাংসারিক কাজে একে অপরের সাহায্য করা। ছেলেমেয়েদের সাথে সময় দেওয়া ইত্যাদি।

মসজিদে যাওয়ার সুন্নতি আমল ঃ- আজানের সাথে সাথে পুরুষরা নামাজ পড়ার জন্য মিসওয়াক সহ অযু অবস্থায় ছোট ছোট পায়ে গমন করা। মসজিদে বসার পূর্বে সুন্নত বা নফল নামাজ পড়া। মসজিদে প্রবেশে দোওয়া (আল্লাহুম্মাফ্ তাহলি আবওয়াবা রহমাতিকা)। বাম পা দিয়ে দরুদ পড়ে মাসজিদ থেকে বের হওয়া ও দোওয়া পড়ে নেওয়া। মসজিদ থেকে বার হওয়ার দোওয়া হলো (আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা)।

নামাজ শেষে সুন্নাতি আমল ও দোওয়া ঃ- প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করে ৩ বার (আসতাগফিরুল্লাহ) ৩৩ বার (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার (আলহামদুলিল্লাহ) ও ৩৪ বার (আল্লাহু আকবর) পাঠ করা। ফযিলতঃ আল্লাহ সমস্ত হাজত পূরণ করে দেবেন। এছাড়াও জোহর, আসর ও এশা বাদ ১বার করে সুরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করা। (ফযিলত ঃ হঠাৎ বিপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন)। ফজর ও মাগরির বাদ সুরাগুলো তিনবার করে পাঠ করা।

খাওয়ার সুন্নতি আমল সমূহ ঃ- হালাল হারাম যাচাই করে খাওয়া। খাওয়ার সময় (বিসমিলিল্লাহি ওয়া াালা বারকাতিল্লাহ) এই দোওয়া বলে খাবারের একদিক থেকে খাওয়া শুরু করা। খাওয়ার শেষে দোওয়া সমূহ পাঠ করে নেওয়া।

(আলহামদুলিল্লাহি আতআমানা, ওয়াসাকানা, ওয়াজা আলানা মিনাল মুসলিমীন।)

ঘুমানোর সুন্নতি আমল সমূহ ঃ- আমরা আমাদের জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমিয়ে কাটায়। সে হিসাবে ঘুমানোটা যদি সুন্নাত মোতাবেক করে থাকি তাহলে এবাদতে গন্য হবে। চেষ্টা করা অযু অবস্থায় শোওয়া, বিছানায় ডান পা দিয়ে ওঠা, বিছানা ৩ বার ঝেড়ে নেওয়া। ৩৩ বার (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার (আলহামদুলিল্লাহ) ও ৩৪ বার (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা। তিনবার সূরা এখলাস, তিনবার সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করে গায়ে হাত বুলিয়ে নেওয়া। তাহাজ্জুদ এবং ফজরের জামাতে নামাজ পড়ার নিয়েত করে শোওয়া। জীবনের শেষদিন মনে করে তওবা পড়া, কালমা ও দরুদ পাঠ করে নেওয়া। ডানদিকে কাত হয়ে এই দোওয়া পড়ে শূঁয়ে পড়া। (ফজিলত ঃ আল্লাহ্ তায়ালা একজন প্রহরী নিয়োগ করে দিবেন)।

সার্বক্ষনিক কয়েকটি দোওয়া ও যেকের ঃ- যা অন্তরের অন্তস্থল থেকে পাঠ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হওয়া যাবে। ইনশা-আল্লাহ্

১। (সুবলানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল্ আযীম)

২। (আসতাগফিরুল্লাহি ওয়াতুবু ইলাইহি লাহাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)।

৩। (ইয়া জালজালালু ওয়াল ইলরাম)।

৪। (ইয়া মুকল্লাবাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দিনিকা)।

৫। (রব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান্ নারি)।

৬। যে কোন দরুদ পাঠ করা।

উক্ত দোওয়া গুলো কাজকর্ম ও অবসর সময়ে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে অযু ছাড়াও পড়া চলে।

শেষ বিচার

মারিয়াম খাতুন
অষ্টম শ্রেণী

ক্ষুদ্র হতে আরো ক্ষুদ্রের
হিসাব দিতে হবে,
শেষ বিচারে এক বিন্দু
ছাড় নাহি পাবে।

পাপ পূণ্যের হিসাব নিকাশ
চাইবেন বিচারপতি,
সেদিন কারো ঠিক থাকবে না
কোন মতিগতি।

কর্ম তোমার যেমন হবে
তেমন হবে ফল,
তোমার গায়ের পশমগুলি
হিসাব দিবে অনর্গল।

কঠিন সেই দিনের কথা
ভাবতো যদি লোকে,
জেনে শুনে করতো না পাপ
এই দুনিয়ার বুকে।

খুব সামান্য ভালো কাজের
পাবে সেদিন পুরষ্কারও
নিরপেক্ষ বিচার হবে
আল্লাহর দরবারে।

শেষ বিচারের কথা ভেবে
মাসুমা খাতুন কাঁদে,
না জানি কি ঘটবে সেদিন
এই অধমের সাথে।

সীতাপুর মাদ্রাসা

জুয়াইরিয়া সুলতানা লস্কর
অষ্টম শ্রেণী

জ্ঞানের আশা মিটবে মোদের,
সীতাপুর মাদ্রাসায়।
কোরান হাদিস, উসুল ফেকাহ,
পড়ব সবই হেথায়।
চরিত্রকে গড়বো মোরা,
আর শিখবো শরীয়ত।
করবো নাকো আমরা কভু,
শেরেক এবং বেদায়াত।
শিক্ষকদের করব সেবা,
করব তাদের সম্মান।
সার্থক হবে মোদের তরে,
পড়া হাদিস কোরআন।
চারিদিকে এ মাদ্রাসার,
ছড়িয়ে আছে খ্যাতি।
জ্বলছে হেথা ঝলমল করে,
ইসলামের বাতি।
শরীয়াতের আইন কানুন,
শিক্ষা হেথা পাই।
তাইতো মোরা ইহার এত,
কীর্ত্তি গাথা গাই।
ওস্তাদগণ হুকুম করেন,
শয়তানী পথ ছাড়।
কোরান হাদীস পড়ে সবাই,
জ্ঞানের ভিত্তি গড়ো।
তাই বলি ভাই মুসলিমগন
হও গো সচেতন।
এই এলমই শিক্ষা কর,
দিল হবে রওশন।
এই নৌকায় যে দিয়েছে পাড়ি,
হয়েছে সে লাভবান।
তারই আজকে কতই না সম্মান।

আজকের দিনে কম্পিউটার

সুস্মিতা পাল

শিক্ষিকা, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

কম্পিউটার একটি বহুমুখী ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয় উপাদানের সমন্বয়ে, এটি বাইনারি কোডের নীতির উপর কাজ করে তথ্য উপস্থাপন করতে এক এবং শূন্য ব্যবহার করে। ব্যক্তিগত ল্যাপটপ থেকে শুরু করে শক্তিশালী সার্ভার পর্যন্ত, কম্পিউটারগুলি বিভিন্ন প্রকারে এবং আকারে আসে যা মৌলিক গণনা থেকে জটিল সিমুলেশন পর্যন্ত কাজগুলিকে সহজতর করে। কম্পিউটারের বিবর্তন লক্ষণীয়, প্রক্রিয়াকরণের গতি, সঞ্চয়, ক্ষমতা এবং সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাক্ষী। সমসাময়িক সমাজে, কম্পিউটার শিক্ষা, ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনোদনের মতো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আমাদের যোগাযোগ, কাজ এবং তথ্য অ্যাক্সেস করার উপায় তৈরি করে।

কম্পিউটারের ইতিহাস প্রাচীন যুগের যখন মানুষ অ্যাবাকাসের মতো গণনা সরঞ্জাম ব্যবহার করত। যাইহোক, আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ ১৯ শতকে শুরু হয়েছিল। চার্লস ব্যাবেজ, ''কম্পিউটারের জনক'' হিসাবে বিবেচিত, ১৯৮০-এর দশকে বিশ্লেষণাত্মক ইঞ্জিনের ধারণা করেছিলেন এটি একটি প্রাথমিক যান্ত্রিক কম্পিউটার ডিজাইন।

বিংশ শতাব্দীতে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের উদ্ভাবনের মাধ্যমে আসল অগ্রগতি ঘটে। অ্যালান টুরিং-এর কাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কম্পিউটিংয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং ১৯৪০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ENIAC (ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর এবং কম্পিউটার) এবং UNIVAC (ইউনিভার্সাল স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার)এর মতো ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে মেইনফ্রেম কম্পিউটারের উত্থান প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল যা বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত বড় শক্তিশালী মেশিন ছিল। ১৯৭০ এর দশকে মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাব ঘটে, যার ফলে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের বিকাশ ঘটে। আইবিএম , অ্যাপল এবং মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানীগুলি ব্যক্তিগত কম্পিউটিংকে জনপ্রিয় এবং অগ্রসর করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে হার্ডওয়্যারের উন্নতি এবং গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসের উত্থানের সাথে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের দ্রুতবিবর্তন দেখা যায়। ১৯৯০ এর দশকে ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে, কম্পিউটিংকে একটি বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্কে রূপান্তরিত করে।

একবিংশ শতাব্দীতে, কম্পিউটিং শক্তি অগ্রসর হতে থাকে, যার ফলে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রসার ঘটে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কম্পিউটার এখন চিত্র শনাক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের মতো জটিল কাজ করতে সক্ষম। কম্পিউটারের ইতিহাস ক্রমাগত উদ্ভাবনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক ডিজিটাল যুগে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি, কাজ করি এবং মিথস্ক্রিয়া করি তা গঠন করে।

কম্পিউটার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য সুবিধা প্রদান করে :

১। দক্ষতা ঃ কম্পিউটারগুলি জটিল গণনা সম্পাদন করতে পারে এবং মানুষের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ডেটা

প্রক্রিয়া করতে পারে, যার ফলে ডেটা বিশ্লেষণ, সিমুলেশন এবং গণনার মতো কাজগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২। তথ্য অ্যাক্সেস ঃ ইন্টারনেট, কম্পিউটারের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য, তথ্যের একটি বিশাল ভান্ডার প্রদান করে, যা ব্যবহারকারীদের জ্ঞান অ্যাক্সেস করতে, গবেষণা পরিচালনা করতে এবং বিশ্বব্যাপী অবগত থাকতে সক্ষম করে।

৩। যোগাযোগ ঃ কম্পিউটারগুলি ইমেল, তাৎক্ষণিক বার্তা এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুবিধা দেয়, রিয়েল-টাইমে বিশ্বজুড়ে মানুষকে সংযুক্ত করে।

৪। অটোমেশন ঃ কম্পিউটারগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলির স্বয়ংক্রিয়তা সক্ষম করে, কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং শিল্প, ব্যবসা এবং দৈনন্দিন জীবনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৫। সঞ্চয়স্থান ঃ কম্পিউটারগুলি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য স্টোরেজ সমাধানগুলি অফার করে যা ব্যবহারকারীদের নথিএবং ফটো থেকে শুরু করে সঙ্গীত এবং ভিডিও পর্যন্ত প্রচুর পরিমানে ডেটা সঞ্চয়, সংগঠিত এবং পুনরুদ্ধার করে।

৬। সৃজনশীলতা এবং ডিজাইন ঃ কম্পিউটারে শক্তিশালী সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের সৃজনশীল প্রচেষ্টায় ক্ষমতা দেয় যেমন গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং এবং 3D মডেলিং, উদ্ভাবন এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তিকে উৎসাহিত করে।

৭। শিক্ষা ঃ কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে, ইন্টারেক্টিভ শেখার অভিজ্ঞতা, অনলাইন সংস্থান এবং শিক্ষামূলক সফটওয়্যার প্রদান করে যা শেখার প্রক্রিয়াকে উন্নত করে।

৮। ব্যবসা এবং অর্থ ঃ কম্পিউটারগুলি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ অ্যাকাউন্টিং, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং আর্থিক বিশ্লেষণের মতো কাজে সহায়তা করে, কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখে।

৯। চিকিৎসা অগ্রগতি ঃ চিকিৎসা গবেষণা, ডায়াগনস্টিকস এবং চিকিৎসা পরিকল্পনায় কম্পিউটারগুলি সহায়ক ভুমিকা পালন করে, যা স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি এবং রোগীর ফলাফল উন্নত করে।

১০। বিনোদন ঃ কম্পিউটারগুলি গেমিং এবং স্টিমিং থেকে শুরু করে ডিজিটাল মিডিয়া তৈরি পর্যন্ত বিস্তৃত বিনোদনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে, অবসর এবং বিনোদনের জন্য বিভিন্ন বিকল্প সরবরাহ করে।

১১। গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ঃ ইন্টারনেটের মাধ্যমে, কম্পিউটার বিশ্বব্যাপী কানেক্টিভিটি, যোগাযোগ বৃদ্ধি, সহযোগিতা এবং অভূতপূর্ব স্কেলে ধারণা বিনিময়কে সহজতর করে।

১২। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Al- Aritificial Intelligence) ঃ Al বা Aritificial Intelligence হল যে তথ্য বিজ্ঞানের শাখা যা কম্পিউটার বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রোগ্রাম বা অ্যালগরিদম তৈরী করে। এটি সংগঠিত তথ্য, লজিক এবং স্বযোগ্য প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে সিস্টেমগুলির জন্য বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে। Al ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা হয়, যেমন স্বায়ত্ত্বশাসিত গাড়ি, ভাষা অনুবাদ, রোবোটিক্স, চিত্র শনাক্ত বা গানন পরামর্শ ইত্যাদি। Al তথ্য প্রসেসিং, মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে এবং এর উদ্ভব থেকে বহুল আশাপ্রদ সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

সর্বপরি বলা যায়, আমাদের আধুনিক মানব সমাজ এবং জীবনে কম্পিউটার একটি অপরিহার্য অঙ্গ তাই কম্পিউটার শিক্ষা ছাড়া আমাদের শিক্ষাজীবন অসম্পূর্ণ।

মাদ্রাসা শিক্ষা

সেখ আলিউল ইসলাম

শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

শিক্ষাই আলো, সুশিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, সুশিক্ষিত জাতি আগামীর ভবিষ্যৎ, এ ধরনের উপদেশ বাণী গুলোর চেয়েও শিক্ষার ইতিহাস অনেক পুরনো কারণ যখনই আমরা এই প্রবাদ বাক্য বা উপদেশগুলোর ইতিহাস জানতে যাব তখনই আমরা দেখতে পাবো শিক্ষার ভালো ফল পাওয়ার পরেই সম্ভবত এই ধরনের নীতিকথা উপদেশ মূলক বাক্যগুলির জন্ম হয়েছে। মানব সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শিক্ষার গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। কেননা সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির আদি পিতা আবুল বাশার হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টি করার পর তিনি আদম (আঃ) কে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, শুধু শিক্ষাই দিলেন না সকল মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এই ভূ-মন্ডল তথা পৃথিবীর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন যেমন মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন পাকে বলেন,

''আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি''। — সুরা বাকারাহ

''তিনি আদমকে যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিলেন''। — সুরা বাকারাহ

এই আয়াতাংশগুলি দ্বারা আমরা সর্বপ্রথম শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম মানব আদম (আঃ) কে শিক্ষা প্রদান করলেন।আর ভাষাতত্ত্ব সর্বপ্রথম জ্ঞান হওয়া এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানব একজন জ্ঞানী তা জানা গেল। এই পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন নবীদের আল্লাহতায়ালা প্রেরণ করেছিলেন বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে, যাতে করে তারা তাদের উন্মতের শিক্ষা, তাদের স্রষ্টার সম্পর্কে অবগত করানো, স্রষ্টার এবাদত উপাসনা করার রীতি-নীতি এবং ইহকাল ও পরকালে যাতে সাফল্য অর্জন করতে পারে, তার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। নবীগণ এ জাতীয় শিক্ষা নির্দিষ্ট স্থানে, উপাসনা কেন্দ্রে মহান প্রভুর বাণী ও সময় উপযোগী উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব সমাধা করতেন।

উম্মতে মোহাম্মাদীর শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয় মহান পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার বানী অর্থাৎ ''তুমি পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'' এই বাণীর মাধ্যমে।

ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র তথা মাদ্রাসা ছিল মসজিদে নবাবিতে অবস্থিত সুফফা। এই মাদ্রাসা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাঃ নিজে, আর এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন সাহাবীগণ। সুফফার ছাত্রদেরকে আসহাবুস সূফফা নামে অবহিত করা হতো। এখান থেকেই ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মানবতা, সমাজিকতা, শিষ্টাচার, কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইসলামি দর্শন, আকিদা বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হত। সর্বপরি মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনে সাহায্য ও সাহযোগিতা করা।

আর খোলাফায়ে রাশিদুন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিসরে উন্নতি ঘটে এবং সার্বিকভাবে সাফল্য অর্জন করে। ফলে তৎকালীন সময়ে একজন শিক্ষাত্রী যেমন ধর্মীয় শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়ে 'আলিম' হতেন তেমনি তার পাশাপাশি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ,

চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ ইত্যাদি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হতেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা মানে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র বলেই মনে করে। কিন্তু এই ধারণা কোন কালেই ঠিক নয়। আবার অনেকেই মনে করে থাকেন মাদ্রাসায় পড়া ছাত্ররা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধুমাত্র ইমামতি, ওয়াজ নসিহাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, এই ধারণাও ঠিক নয়। কেননা আমরা যদি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাব ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় সমূহের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তৎকালীণ সময় একজন ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদ্রাসার ছাত্র একাধারে একজন আলিম তৎসহ চিকিৎসক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভূত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করত। উল্লেখ্য যে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন যারা ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ভূতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যেমন —

ইবনে সিনা (যিনি সারা বিশ্বে আভিসিনা নামে পরিচিত), যিনি মাত্র ১০ বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হন অতঃপর তিনি ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হন তৎসহ কবি, দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিদ হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেন। এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লেখা তার বই ''কানুন ফিত-তিব'' যা একটি চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ, আরেকটি হল 'কিতাবুশ শিফা' যেটি একটি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ যা তাঁকে বিখ্যাত করে রেখেছে।

জালালউদ্দিন রুমি, যিনি বিশ্ব বিখ্যাত আলেম তৎসহ কবি, দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ইবনে খালদুন- তিনি অল্প বয়সে কুরআনের হাফিজ হন এবং হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং তিনি কামহিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ও গ্রান্ড কাজির দায়িত্ব পালন করেন। আবার তিনি একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে স্মরনীয় হয়ে আছেন।

আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান — যিনি পাশ্চাত্য বিশ্বে জেবার নামে বিখ্যাত, যাকে আরব রসায়নের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম অ্যালকোহল আবিস্কার ও উন্নত করেন। তিনি ইমাম জাফর আস সাদিক এর সূযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

আল বিরুনি — যিনি ধর্মে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর তুলনামূলক ধর্মের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মও অধ্যায়ন করেন। একারনে তাকে ইন্ডোলজির প্রতিষ্ঠাতা ''তুলনামূলক ধর্মের জনক'' বলা হয়। এছাড়া তিনি পদার্থ বিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

এই ধরনের অনেক মুসলিম পণ্ডিত বিখ্যাত হয়ে আছেন যারা একদিক দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যদিকে ভূতত্ত্ববিদ, রসায়নবিদ, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে ও আবিস্কারে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

বর্তমান সময়ের মাদ্রাসতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পড়ানো হয়ে থাকে, কেননা ইসলামের সূচনা থেকেই ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যান সার্বিকভাবে সাফল্য অর্জন করা। ঠিক অনুরূপ প্রত্যেক মুসলমানের লক্ষ্য থাকে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করা। আর কোন মুসলমান ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করতে চাইলে তাকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা দরকার। কেননা উভয়কালের সাফল্য ও কল্যানের নিশ্চয়তা একমাত্র মদ্রাসা শিক্ষায় দিয়ে থাকে। কারণ একমাত্র ধর্ম শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় করে পড়ানো হয়ে থাকে কেবলমাত্র মাদ্রাসাতেই। যা সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে পাওয়া যায় না।

এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রচলিত শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা যে কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই তা আমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো। কারণ বর্তমান সময়ে একজন মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র যেমন চিকিৎসক হতে পারে, তেমনি বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি হতে পারে। মাদ্রাসায় পড়া ছাত্ররা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধুমাত্র ইমামতি, ওয়াজ নসিহাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ইসলাম ধর্মে নেই। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান ও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানবিক, সমাজিক, সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তি গড়ে তোলা। সৎ পথে হালাল উপার্জন করে জীবন নির্বাহ করা এবং মহান সত্তার প্রদান করা বিধান অনুযায়ী সঠিক ভাবে ইবাদত উপাসনা করার উপযুক্ত গড়ে তোলা। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৃষ্টি-সভ্যতা, দীন-ঈমান, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদি সংরক্ষণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনৈতিক কাজে যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যাভিচার, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, মাদক ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করার মতো নজির তেমন পাওয়া যায় না। প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান ও অসহায় এতিম শিশুদের ধর্মপ্রাণ বিত্তবানদের সহযোগিতায় এসব প্রতিষ্ঠান আজও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার-প্রসার ও নিরপেক্ষতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অতএব সৎ ও আদর্শ জাতি গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। নৈতিক, আদর্শিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন জনশক্তি উৎপাদনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার কোনো বিকল্প নেই। এই গুরুত্বপুর্ণ দিকটি অবশ্যই শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। অতএব দেশের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ, আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

রোমন্থন

সুশান্ত ঘোড়ই

শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

যন্ত্র সভ্যতার যুগে কেমন যেন যান্ত্রিক আমরা
সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর নেশায় মগ্ন।
মুঠোফোনের মায়াজালে দৈনিক বাগ ধারা
কিছু ব্যস্ততা, কিছু বাস্তবতা,
কিছু লুকানো হাসি, কিছু অপ্রকাশিত বেদনা,
শত আপনজনের মাঝে একান্তই একলা আমি।

অভ্যস্ত দৈনিক রুটিনের ছন্দপতন ঘটিয়ে
চির নবীন শিক্ষানবিশ মনটা ছুটে যেতে চায়
ঐ কংক্রিটের পাঁচিল ঘেরা বারান্দা টপকে
শান্ত পুকুরের পাড়ে
নীরব দর্শক হতে।
পড়ন্ত বিকেলে দিগন্তের সূর্যাস্তকে
দেখি প্রাণ ভরে,
ছুটে যাই শৈশবে,
ছুটে যাই খেলার মাঠে,
ছুটে যাই স্মৃতির পুরানো পাঠে।

মা

আরিফা খাতুন

অষ্টম শ্রেণী

সবার থেকে বাসি ভালো
আমার মাকে
সকল কাজের মধ্যে আমি
খুঁজি শুধু তাকে।
সবাই বলে বাবা বড়ো
আমি বলি না,
আমার কাছে বড়ো যিনি
তিনি আমার মা।
দুঃখ আঘাত যখন আসে
কেউ তো থাকে না।
চোখের জল মুছিয়ে দিতে
বুকে টানে মা।

আধুনিকতার নিরীখে সৈয়দ আলাওল

রেবেকা খাতুন (শিক্ষিকা)

'আধুনিকতা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে'।

জীবের বিবর্তনবাদের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন Survival of the fitest। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা ধর্মমূলক ও দেব মাহাত্ম জ্ঞাপক সাহিত্য নয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ মুসলমানী লোক সাহিত্যের জন্ম হয়। কবি নিজে সুফী হলেও এ সাহিত্য ছিল একান্ত ভাবে মানবিক প্রেমাবেদন ঘনিষ্ঠ ।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে তুর্কী আক্রমন এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন বড় মাপের পরিবর্তন সাধন করেছিল তেমনি সাহিত্যে শিল্পে ধর্মেকর্মে এই বিজাতীয় দর্শন ও জীবনধারা দৃষ্টি গ্রাহ্য পরিবর্তন সম্ভাবিত করে তুলেছিল। দেব দেবীর মাহাত্ম নিরপেক্ষ নরনারীর প্রণয় কাহিনী ও নীতিকথাকে উপজীব্য করে যথার্থ লৌকিক উপাখ্যান মূলক কাব্য রচনা — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব বস্তু — নূতন আলোর ঝলকানি। আরাকানের মুসলমান কবিরা আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার বহু পূর্বে আধুনিক জীবন চেতনার আভাস দিয়ে গেছেন। ভারত চন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' বাংলা কাব্য ভাষার রাজ্যে আঠারো শতকে যে বিপ্লব এনেছিল সতেরো শতকে আলাওলের লেখায় তার স্পষ্ট পূর্বসূরীত্ব পেলাম।

কবির আত্মপরিচয় অন্ধ কারাচ্ছন্ন। তিনি নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু না বলে গেলেও 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন —

''মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান
তথাত জালালপুর পুন্যবত স্থান।''

ষোড়শ শতকের অন্তিম পর্বে তাঁর জন্ম মুলুক ফতেহাবাদ। কারোমতে এটি চট্টোগ্রামের অর্ন্তভুক্ত মতান্তরে ফরিদপুরে। কবি মন্ত্রী পুত্র হওয়ায় যুদ্ধ বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী। কথিত আছে পিতার সঙ্গে জলযাত্রার সময়ে পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি পিতৃহীন হন। আরাকানের হাটে দাস রূপে তিনি বিক্রিত হন। সামান্য অশ্বারোহী সৈনিকের জীবন শুরু করে তিনি আরাকানের অভিজাত বংশের সন্তানদের নাট্য গীত ও সঙ্গীত শিক্ষক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের নজরাধীন হন। মাগন ঠাকুরের উৎসাহ ও প্রেরণায় শুরু হয় তাঁর কাব্য রচনা। তাঁর প্রথম কাব্য পদ্মাবতী। এটি হিন্দি কবি মহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের ভাবানুবাদ। আলাওল পদুমাবৎ কাব্যকে হুবুহু অনুকরন করেননি কাহিনীতে স্বল্প পরিবর্তন এনেছেন। জায়সীর কাব্যের অলৌকিক ঘটনাকে তিনি বর্জন করে মানব মানবীর প্রেমকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রেমের কাব্য রোমান্টিক প্রনয়গাথা বলে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। বৈষ্ণব প্রেম কবিতার সঙ্গে এর একটি প্রধান পার্থক্য ধনসম্পৃক্তির অভাবে। আলাওল সুফী মতে বিশ্বাসী ছিলেন। জায়সীর মূলকাব্য পদুমাবৎ আসলে সুফী ধর্ম সাধনার রুপক মাত্র, এই রূপকটি কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যের সমাপ্তিতে — 'চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে।' চিতোর হল মানব দেহ, রাজা রত্ন সেন মন, সিংহল হৃদয়। আলাওলের অনুবাদ মূলের অতিরিক্ত মূল্য পেয়েছে —

''প্রেমবিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।''

আবার কোথাও লিখেছেন —

''মরনেতে মুক্তি হেন যার মনে বাসে
শাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে।''

বা —

''যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া
কিবা তার রূপ রেখা কিবা তার কায়া।''

আলাওলের কাব্যের প্রকৃত স্বাদ জীবনের একটা বিপুল সমুন্নত ও তরঙ্গিত রূপের উপভোগে। মঙ্গল কাব্যের জীবন চিত্রনে - যে শিথিল পরিবার মুখিতা, গার্হস্থ্য প্রাত্যহিকের যে কোমল ইন্দ্রিয়ালুতা তা থেকে আলাওল আমাদের যেন অকস্মাৎ 'শ্যেনসম ছিন্ন করে' উর্দ্ধে নিয়ে যান — প্রচন্ডের মুখোমুখি দাঁড় করে দেন। বিপদের দোলায় সমগ্র সত্তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেন। যুদ্ধ বর্ননা অবশ্য ধর্মমঙ্গলেও আছে কিন্তু তার ছন্দে সুরে সেই উদ্দামতা নেই, মামুলী ঘটনা ছাপিয়ে জীবন জিজ্ঞাসার কোন নবতর সত্যে তার প্রতিষ্ঠা নেই। অবশ্যই রত্ন সেনের অতি উল্লাসিত বেদুইন বৃত্তি তাঁর নিজস্ব। পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য রত্ন সেন যে ভাবে যোগী বেশে সিংহল যাত্রা করেছেন তাতে তার প্রেমের একাগ্রতা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে —

''কার কথা না শুনিয়া নৃপ হৈল যোগী,
চলিল প্রেমের পন্থে বিরহ বিয়োগী।''

— এই রত্ন সেনের মধ্যে রয়েছে মানবিকতার স্পর্শ এর জন্য সবস্ব ত্যাগেও তাঁর কুণ্ঠা নেই।

কবি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আরবি ফারসী ভাষার মধ্যে তাদের কাব্য চর্চা সীমিত না রেখে বাংলা ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করে দেবদেবীর মাহাত্ম কীর্তন না করে মানব জীবনের কাহিনী লিখে মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সংযোজন করেন। — এখানেই তিনি আধুনিক।

নিবন্ধ সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসাও নবমূল্যায়ন — ক্ষেত্রগুপ্ত।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন (দ্বিতীয় খন্ড)
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খন্ড)
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ শ্রীমন্ত কুমার জানা (দ্বিতীয় খন্ড)
৫। মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য — ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলম

তাসকিন তাবাস্‌সুম

সপ্তম শ্রেণী

কলম তো চলে সদা,
তোমার ইশারায়।
যা কিছু লিখি,
সবই তোমার দয়ায়।

কলমের নিবে থাকে
এমনই এক জোর
জালিমের ভিত যেন,করে থর থর।
লিখে যেতে পারি যেন,

সত্যের গান।
সর্বদা চাই তোমার,
দয়া অফুরান।

পড়াশোনা

আসিফ জামান শেখ
অষ্টম শ্রেণী

শুভ হোক আমাদের হোস্টেলের ছেলেরা
ভালো রেজাল্ট করতে পারে কিনা তারা।
আমাদের হোস্টেলের শিক্ষকরা কতই না চেষ্টা করে,
আমরা কিন্তু পড়াশোনা করিনা তারও পরে।
পড়াশোনার মর্যাদা কেউ যদি জানতো,
তাহলে আমাদের অনেক সফলতা আসতো
পড়াশোনার মর্যাদা যে ব্যাক্তি পেয়েছে,
সে ব্যাক্তি হাফেজ, মাওলানা, ডাক্তার হয়েছে
আজ কাল অনেক মানুষ পড়াশোনা ছেড়েছে,
কারণ তাদের কাছে খেলাধুলা প্রিয় হয়েছে।
খেলাধুলা করিও না আর এসো পড়াশোনার দিকে,
পড়াশোনা কী ভয় দেখিয়েছে তোমার মনকে?
তুমি যখন পিছিয়ে যাবে পড়াশোনার দিক থেকে,
পড়াশোনা কখনো হবে না আর মন থেকে।
যদিও মন চায় খেলাধুলা করি,
তবু এসো খেলাধুলা না করে পড়াশোনা করি।

কলম তোমার শক্তি

হাজেরা খাতুন
নবম শ্রেণী

উপদেশ দেবার আগে
নিজে মানুষ হও;
নিজে মানুষ হয়ে তুমি
অন্যকে উপদেশ দাও।
সঠিক মানুষ হলে তুমি
সমাজ সঠিক হবে;
আমজনতা সবাই তখন
সঠিক তোমায় কবে।
সমাজের শ্রেষ্ঠ কবি
হইবে সেই দিন;
সমাজের মানুষ তোমায়
সঠিক বলবে যেই দিন।
জাগ্রত করো বিবেক
ঘুচিয়ে দাও অন্যায়;
তোমার লেখনীর মাধ্যমে
ভাসিয়ে দাও বন্যায়।
আমি বলি
কলম তোমার শক্তি;
তুমি সদা লিখে যাও
দেশকে করো ভক্তি।

নারী শিক্ষার অবস্থা এবং বর্তমান ভারত

আয়েশা খাতুন
দশম শ্রেণী

ভারত এখন জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রথমে অবস্থান করে। এতদিন পর ভারত চীনকে পিছনে রেখে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অনেক মানুষ ভারতে এখন। কিন্তু দেশের কী কোন উন্নতি হয়েছে? শিক্ষার হার কী বৃদ্ধি পেয়েছে? সামাজিক কুসংস্কার কী বন্ধ হয়েছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পুরোপুরি নেই, কারন পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এখনও সামাজিক কুসংস্কার। অতীতে বেশি ছিল এখনও কিছু রয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা বড়ো কুসংস্কার হলো 'বাল্যবিবাহ'। বাল্য বিবাহের হার শহরের দিকে কম হলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে এটা প্রচলিত আছে। ১৪-১৫ বছরের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তাদের পড়াশোনা তাদের স্বপ্ন গুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামে যখন কোনো বাড়িতে মেয়ে জন্মায় তখন তার পিতার উপর যেন এক বোঝা এসে পড়ে। যে কোনো ভাবে শুধু বিয়ে দিতে পারলে তারা বেঁচে যায় এবং সেই মেয়েকে ছোটোবেলা থেকেই বোঝানো হয় যে তাকে পরের বাড়ি পরের সংসারে যেতে হবে কিন্তু এইসব বিষয়ে প্রচুর পরামর্শ দিলেও শিক্ষার বিষয়ে কোনো পরামর্শ দেয় না। সেই মেয়েওবড়ো হয় এই মানসিকতা নিয়ে। আজ মুসলিম সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজ-এ শিক্ষার হার অনেক বেশি তারা তাই তাদের সমাজকে উন্নত করছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে তা হচ্ছে না। শিক্ষার হার বৃদ্ধি হচ্ছে না তা নয়, বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শহরের অংশে। যদিও ভারতের জনসংখ্যার দিক দিয়ে তা অতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য এবং বৃহত্তর অংশই পিছনে নিরক্ষর, অশিক্ষিত, কথা বলার আদর্শ ইত্যাদি কিছুই নেই। তাদের মধ্যে পিছনে রয়ে গেছে তারা। কী করে উন্নতি হবে দেশের যদি নারী শিক্ষা না হয়। একটি পরিবারে যদি স্ত্রী লোকই অশিক্ষিত হয় তাহলে সে বাড়ির সন্তানেরা কী করে শিক্ষা লাভ করবে ? কীভাবে শিক্ষার মর্ম বুঝবে তারা ? তারাও তো অশিক্ষিতই হবে। এবং যেই বাড়িতে তাদের মেয়েদের পড়াশোনা করানোর ইচ্ছা আছে কিন্তু অভাবের কারনে তারা পারে না এবং সমাজের কারনে তারা পারে না। সমাজ কী বলবে তা ভেবে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারে না। একটা সময় এই নারী শিক্ষার জন্য কতই না বাধা বিপত্তিকে এড়িয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লড়াই করেছেন। তা সবই কী বিফল হয়ে যাবে? আমাদের ইসলামও আমাদের বলেছে ''শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরজ কর্তব্য''। তাই আমাদের সকলের শিক্ষা গ্রহন করা উচিত যাতে করে আমাদের সমাজ এগিয়ে যাক উন্নতির দিকে এবং একজন নারীর হাতে হাড়ি, থালাবাসন নয় বরং বই, খাতা দিতে হবে যাতে আমাদের সমাজকে আমরা আরো উন্নত করতে পারি এবং আমাদের দেশকেও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সব কুসংস্কার পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকেই। কারন আমরা হলাম এদেশের ভবিষ্যৎ। যেদিন আমরা উন্নতি করতে পারবো সেদিনই হবে দেশের কল্যান মানবজীবনের কল্যাণ।

আখলাকুলমুমিনিন (মু'মিনের চরিত্র)

মুহাম্মাদ উমার ফারুক মিদ্দা
শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আসসলাতু অসসালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়া ই অলমুরসালিন মুহাম্মাদিন সল্লল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা আলিহি আসহাবিহি আজমাঈন।

মু'মিনের চরিত্র সম্পর্কে লিখিতে গেলে অনেক কিছুই প্রসঙ্গ আসিবে। আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বিষয় উল্লেখকরিতেছি একজন মুসলমান ঈমানদার আদর্শবান সত্যবাদী সৎ চরিত্রবান হইবেন প্রকৃত মুমিন যিনি যত চরিত্রবান তিনি তত বেশি মু'মিন। মু'মিন ব্যক্তির সদা সর্বদা খেয়াল থাকিবে ইসলামী আদর্শের উপর। সহি ঈমান আক্বীদা নিয়েই সৎআমল করা। সৎআমল করে চলাই একজন প্রকৃত মু'মিন। ব্যক্তির অবশ্যই কর্তব্য। একজন মু'মিন যেমন একদিকে সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত নিয়মিত ইসলামী তরিকায় সৎআমল করিয়া চলেন। আবার অন্য মানুষের সাথে সদা সৎ ব্যবহার করিয়া চলেন। যেমনভাবে একজন মুমিন বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে সারা জীবন ভোর নিয়মিত সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা যাকাত আদায় করা ও হজ্ব পালন করা এবং আরো অন্যান্য সৎ কাজের বিষয়ের প্রতি যথাসাধ্য খেয়াল রাখেন। অন্যদিকে পরোপকার এবং সমাজের উন্নয়ন দিকে লক্ষ্য রাখেন। একদিকে যেমন সৎ কাজে আদেশ করেন অপরদিকে অসৎ কাজে নিষেধ করেন। আল্লাহ তাআলা কুর্আনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন — কুনতুম খাইর উম্মাতিন উখরিজাতলিন্নাসি তা' মরুনা বিল মা'রুফি ওয়াতানহাওনা আ'নিল মুনকারি (সূরা আল ইমরান) (তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত মানজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে তোমার সৎকাজে আদেশ করো এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রক্ষা করে চলো।) কেবলমাত্র নিজের ভালো আমলের প্রতি খেয়াল রাখলেই চলিবেনা। নিজের ভালো আমলের সাথে সাথে অপরকেও সৎ কাজের আহ্বান করিতে হইবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতে হইবে। নিজে যেমন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিবার চেষ্টা করিবেন অপরদিকে পরিবারবর্গ এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। আল্লাহতালা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার। (সূরা আত্তাহরীম) হেঈমানদারগণেরা তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও অর্থাৎ এই আয়াতের দ্বারা আমাদের প্রতি হুকুম হইয়াছে যে নিজের ভালো আমলের সাথে সাথে অপর ব্যক্তিকেও সৎ পথে নিয়ে একই সঙ্গে ভালো আমলের আহ্বান করিতে হইবে। একজন মু'মিন কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে কোনরকম কোন ক্ষতিকারক বিষয়ের ভাবনা বা আলোচনা করিতে পারেন না। সর্বদা সৎ চিন্তাভাবনা কর্ম নিয়েই জীবন যাপন করিতে হইবে। রসূলাল্লাহ সল্লল্লহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন লাইসাল মু'মিনল্লাজি ইয়াশ বায়ু ও জারুহু যা-ইউন ইলাজাম বিহী। (মিশকাত শরিফ) যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে সেই ব্যাক্তি ঈমানদার নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে হল কিছু এমন। দীন পালনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভদ্রতা। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল। আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাত তরিকা।

পিতা মাতার সঙ্গে ব্যবহারের সময় ইহ্সান। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইনসাফ। শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে কঠোরতা। আত্মীয়দের সাথে আচরণের ব্যাপারে সদয়। বড়দের সাথে শ্রদ্ধা ও ছোটদের সঙ্গে স্নেহ পূর্ণ ব্যবহার। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা। ঈমানের বিষয়ে দৃঢ়তা ও বিশুদ্ধতা। একদিকে থাকিবে আল্লাহ তা'আলার ভয় অপরদিকে থাকবে আল্লাহতালার দয়ার আশা।

শির্ক ও বিদয়াত মুক্ত ঈমান। হিংসা অহংকার লোভ মুক্ত মন। মু'মিনের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যমান। দারিদ্রতা ও সচ্ছলতা সর্ব অবস্থাতেই সবর এবং শুক্র করাই মু'মিনের আলামত। ভালো কাজের প্রতি খুশি থাকা এবং মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। অসৎ আচরণের শিকার হইলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। যদি অত্যাচারিত হন তখন সবর করা। মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো কাছে কোনরকম প্রার্থনা করেন না। সর্বসময়ে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেন।

ম্যাগাজিন

আরিফ আনজুম মল্লিক

নবম শ্রেণী

ক্লাসে নোটিস এলো, লিখতে হবে ম্যাগাজিন
ভেবেই অস্থির আমি, কেটে যায় রাতদিন।
কি লিখি ভেবে না পাই কবিতা না রচনা,
মনের গভীর কোণে ভাবের আনা গোনা।
কবিতা লিখতে বসে মেলে নাকো ছন্দ
ভাষা ও ভাবের লাগে অহরহ দ্বন্দ্ব।
রচনা লিখতে বসে অন্য এক ভাবনা,
কাকে নিয়ে লিখবো মোহাম্মদ সামি না মারাদোনা?
রচনা হল না লেখা শুধু চিন্তায় সার
বিশ্বকাপে যেমন হল ভারতের হার।

কাতর প্রার্থনা

সোহানা পারভিন

নবম শ্রেণী

ওগো দয়াল রহিম রহমান,
না চাহিতে মোরে দিয়েছো অফুরান।
তোমার সে দানের মহিমা,
আমি তো বুঝতে পারি না,
শুধু অজ্ঞতায় তার করি অপমান,
জীবন চলেছে শুধু হাসি তামাশায়,
হঠাৎ টান লেগেছে হৃদয়ের সুতায়
দিনে দিনে হলাম আমি অসহায়
কে করিবে ক্ষমা তুমি বিনে হায়;
যতই ভাবি পুণ্য শুধু শূন্যই থেকে যায়।
তুমি তো দয়ার সাগর অতি মেহেরবান,
যা আছে সবই তোমার কুদরতেরি শান;
আমি যে মহাপাপী অতি গুনাহগার
চাহি যে ক্ষমা প্রভু দরবারে তোমার।

মাতৃত্ব

পরভীন সুলতানা
শিক্ষিকা, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

''আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'' — এই চিরন্তন শাশ্বত উক্তিটি করেছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। তাঁর কলমে ঈশ্বরী পাটনি সুযোগ পেয়েও ধনরতন, ঐশ্বর্য, মান খ্যাতি বা আরো বেশি কিছু প্রার্থনা করেনি বরং চেয়ে নিয়েছে নিজের সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার ব্যাকুল আকুতি টুকু। প্রতিটি পিতা-মাতার অন্তরে থাকে যে নিখাদ সন্তান-স্নেহ; তা কোন বিতর্কের মাঝেই ধরা দেয় না। এখানে ''দুধ-ভাত'' বলতে শুধু পুষ্টিকর খাদ্য নয়- এ হলো - সন্তানের কল্যাণে নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মায়ের এক চিরন্তন ভাষ্য। পিতা- মাতাকে তুলনা করা হয় ছায়া দানকারী মহা বৃক্ষের সঙ্গে। পাখি যেমন তার নিরাপদ ডানায় আগলে রাখে তার অসহায় শাবকদের তেমনি পিতা মাতা ও নিজের সবটুকু উজাড় করে দেয় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে।

ইসলাম পিতা মাতাকে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। ইসলাম মতে মহান আল্লাহ তালার পরে মাতা পিতার স্থান। এ প্রসঙ্গে মহান গ্রন্থ আল-কোরআনে বলা হয়েছে — ''তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তি সূচক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না। তাঁদের সঙ্গে বিনম্র ভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলবে। মমতা বেশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বল — হে আমার রব। তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন। (বনী ইসরাইল আয়াত ২৩, ২৪)

এছাড়া সুরা ''লুকমান'' আয়াত ১৪ তে বলা হয়েছে — ''আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু-বছরে সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও''। এছাড়াও কোরআন শরীফের অন্যান্য নানা জায়গায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসেও বহু জায়গায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন - উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি উত্তর দিলেন ''তোমার মা''। তারপর কে? — উত্তর হল — ''তোমার মা''। সে আবারো বলল — তারপর কে? তিনি বললেন — ''তোমার মা''। সে পুনরায় বলল এরপরে কে? তিনি বললেন ''তোমার পিতা'' (বুখারী শরীফ)। প্রিয় নবি আরো বলেছেন ''জান্নাত মায়ের পদতলে''। ইসলাম সব মাকে দিয়েছে অনন্য পদমর্যাদা। মাকে করা হয়েছে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা পুরো দুনিয়ার সব সন্তানকে তাদের মা-বাবার ভালবাসার দায়িত্বরোধ ও যথাযথ সম্মান দেওয়ার তৌফিক দান করুন।

''সবার চেয়ে ভালো আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎকালের শিউলি যেমন ফোটে রাশি রাশি''

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দ হল মা। হাজার দুঃখ যন্ত্রণার মাঝেও যে মানুষটির একটি স্নেহ বাক্য আমাদের সমস্ত বেদনার অবসান ঘটায়, তিনি হলেন মা। মায়ের সঙ্গে সন্তানের থাকে নাড়ির সম্পর্ক। তাই সামান্যতম আঘাতে আমাদের মুখ থেকে যে শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে তা হল - ''মা''। শুধু মানুষই নয় পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী

তার মায়ের কাছে ঋণী। যা কখনোই পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

খুব সামান্য কিছু প্রাণী ছাড়া (যেমন সি হর্স) একমাত্র স্ত্রী রা সন্তান ধারণে সক্ষম। তবে সন্তান ধারণ খুব সহজ বিষয় নয় প্রতিটি মুহূর্তে শারীরিক ও মানসিক নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় হবু মাকে। প্রথম দিকে গা বমি করা এবং বমি হওয়ার সঙ্গে অরুচি; ফলে গর্ভস্থ শিশু এবং হবু মায়ের ওজন হ্রাস হয়ে যেতে পারে। স্তনে বড় ধরনের পরিবর্তন হয় ফলে ভোগ করতে হয় তীব্র যন্ত্রণা। সকালের অসুস্থতা, ঘন ঘন প্রস্রাবের সমস্যা পেট-পিঠ-হাত-পায়ে ব্যথা, ডাক্তারি নানা রকমের পরীক্ষরে মধ্য দিয়ে যেতে হয় হবু মা কে। সেই সঙ্গে চলে বিভিন্ন মানসিক যন্ত্রণা যেমন ঘুম কম হওয়া, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া বা অনাগত সন্তানের বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা ইত্যাদি নানা বিষয় সমালানোর পর সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো কঠিন এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। (যাকে বোঝানোর জন্য বলা হয় একসঙ্গে দশটি হাড় ভাঙ্গার ব্যাথার সমান ব্যাথা পেতে হয় মা-কে।) অনেক সময় নারীরা মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠের পরও শিশু বড় না হওয়া পর্যন্ত তার বেশিরভাগ দায়িত্ব থাকে মায়ের ওপর। মায়ের দুধই শিশুর জন্য পুষ্টির একমাত্র অবলম্বন।

মাতৃত্বের একমাত্র স্বাদ মায়েরা পেয়ে থাকে কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না পরিবারের বটবৃক্ষ যে বাবা এরপর থেকে তার দায়িত্ব অনেক গুন বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল শিশুর প্রারম্ভিক দিনগুলিতে বাবা বা পিতৃ স্থানীয় কারোর যত্ন বা সান্নিধ্য পায় পরবর্তী জীবনে তাদের সাফল্যের হার অনেক বেশী। শিশু দুই মাস বয়সেই তার বাবাকে সনাক্ত করতে পারে। মায়ের পাশাপাশি বাবার কণ্ঠস্বর চেহারা এমন কি শরীরের গন্ধ প্রতিটি শিশুর মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ তৈরি করে। ফলত শিশু বড় হওয়ার সময় তার বাবাই তার প্রথম আইডল হয়ে ওঠে।

সন্তানকে বড় করে তোলার জন্য পিতা-মাতার ত্যাগ-যন্ত্রণা-কষ্ট শুধু মানুষ নয় মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রাণীর ''মাতৃত্বে''র কথা বললে বিষয়টা বোঝা যাবে। যেমন সবচেয়ে ত্যাগি বাবা-মা হলো অক্টোপাস। বাচ্চাদের পৃথিবীতে আলো দেখাতে নিজের জীবন দিতে হয় পিতা অক্টোপাসকে। মা অক্টোপাস ডিম পাড়ে সাগরের নীচে। ডিম গুলো যাতে কাঁকড়া বা অন্য প্রাণী খেয়ে না নেয়, তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সে নিজে না খেয়ে পাহাড়া দেয়। ধীরে ধীরে ডিম ফুটে সন্তান পৃথিবীতে আসে কিন্তু অক্টোপাস মায়ের মৃত্যু ঘটে ৩-৬ মাস অনাহারে থাকার জন্য।

আরেক প্রাণী পেঙ্গুইন যা আমাদের সবার প্রিয়। ছোট্ট এই পাখিটি উড়তে পারে না আমরা সবাই জানি কিন্তু পেঙ্গুইনের পিতা-মাতা আশ্চর্যজনক ভাবে সন্তান প্রতিপালন করে। মা পেঙ্গুইন ডিম দিয়ে সমুদ্রে চলে যায় খাবার সংগ্রহ করতে। আর বাবা পেঙ্গুইন সেই ডিমটি নিজের পায়ের উপর রেখে দেয় মাসের পর মাস, প্রায় না খেয়ে। ওম দিয়ে ডিম ফোটায়। এরপর মা পেঙ্গুইন ফিরে আসে শক্ত সামর্থ হয়ে বাচ্চা পালন করতে। এছাড়াও নানা রকম পোকামাকড়, ব্যাঙ বা অন্যান্য প্রাণী যারা আমাদের আশেপাশেই রয়েছে তারাও কী ভাবে সন্তান পালন করে তা একটু খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়।

''মাতৃত্ব'' — বলতে শুধু মায়ের স্নেহ না মাতৃসুলভ যে স্নেহ তাকেই বোঝায়। একটি শিশুর বেড়ে উঠতে বাবা-মা দুজনের অবদানই অনস্বীকার্য। তাই শুধু বছরে একটি দিন ''পিতৃ দিবস'' বা ''মাতৃদিবস'' পালন করে বাবা মার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায় না। পিতা-মাতাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক, তাঁরাই প্রথম শেখান — ভালোবাসা, দয়া, মায়া ক্ষমা ইত্যাদি নানাগুন। এরপর যখন তারা জীবনের আরও একটি বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করে অর্থাৎ

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সেখানেও তারা পাশে পায় মাতৃ সম পিতৃসম শিক্ষকদের। তাই শিক্ষকদের ''মাতৃত্ব'' ও অস্বীকার করার উপায় নেই।

মরুর বুকে মুহাম্মাদ (সাঃ)

সরিফুল আমিন পিয়াদা

একাদশ শ্রেণী

আরবের বুকে জন্ম তাঁহার
আমিনার কুঁড়ে ঘরে,
চেহারায় তাঁর চাঁদের জ্যোতি
যেন রহমতি নূর ঝরে।
আগমনে তাঁর ধন্য ভূবন
ধন্য আরব বাসী,
গাহে গুনগান আকাশ জমিন
আর মরুর বালুকারাশী।
ধরায় এলেন খোদার হাবিব
তৌহিদি বানী হাতে,
একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন
এক নিষ্ঠতার সাথে।
ডাকিলেন তিনি শান্তির পথে
যে পথে এলাহি মেলে,
পেতাম না কভু এক বিন্দু আলো
মোর প্রিয় নবীজি না এলে।
ওহে আমাদের প্রিয় নেতা
মানব কুলের চূড়ামনি,
স্বপনে-শয়নে দেখা দাও মোরে
দেখে জুড়াবো নয়ন খানি।
জন্ম নিলেন মক্কায় নবী
শুয়ে আছেন মদিনায়,
পৌঁছে দিও মোর সালাম হে মালিক
প্রিয় নবীজির রওজায়।

শুরু করো তুমি প্রভুর নামে

আসলাম ফারুক মল্লিক

হোস্টেল-শিক্ষক সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

শুরু করো তুমি প্রভুর নামে যিনি তোমায় দিয়েছেন জ্ঞান।
পূর্বে তুমি জানতে না কিছু তোমায় করেছেন অক্ষর দান।।

যিনি তোমায় সৃজন করেছেন এক বিন্দু পানি হতে।
অস্তিত্ব ছিল না তোমার, ছিলে না তুমি কোনো মতে।।

মাতৃগর্ভে অন্ধকারে যিনি তোমায় দিলেন এঁকে।
চক্ষু দিয়ে কর্ণ দিয়ে নিজ অনুগ্রহে রাখলেন ঢেঁকে।।

যিনি তোমায় সুঠাম করে দিয়েছেন রূপের বাহার।
বেঁচে থাকার তরেই তিনি জুগিয়েছেন আহার।।

তোমায় করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাতলে দিলেন সংবিধান।
তাঁরই আইন মানো শুধু সরিয়ে দিয়ে সব বিধান।।

যিনি তোমায় পোশাক দিয়েছেন শিষ্টাচারের তরে।
সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার যে উত্তম ব্যবহারে।।

যিনি করেছেন নভোমন্ডলকে সাতটি স্তরে সুবিন্যাস।
তার মধ্যে তুমি কি দেখো কোনো কিছুর বৃদ্ধি-হ্রাস?

যিনি এই ভূপৃষ্ঠকে বিছিয়েছেন অতি সুষ্ঠরূপ।
মাথার উপর ঢেকে রেখেছেন আকাশকে ছাদ স্বরূপ।।

প্রার্থনা করো তাঁরই কাছে, সঠিক পথ দেখাও মোদের।
সে পথে কভু না যাই মোরা, পথভ্রষ্ট পেয়েছো যাদের।।

সে পথে প্রভু চালাও মোদের, যে পথে তুষ্ট রয়েছো।
যারা তোমার প্রিয় হয়েছে, অনুগ্রহ যাদের করেছো।।

বক্ষ মোদের প্রসার করো কাজকে দাও সহজ করে।
এই দুনিয়াই কোনো কাজটাই কঠিন না হয় মোদের তরে।।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য করণীয় কাজ

করনিক সিরাজুল মল্লিক
সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ইন্নাল হামদা লিল্লাহি অসস্বালাতু অসসালামু আলা রসুলিল্লাহ।

''সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাকের জন্য এবং মহান আল্লাহ পাকের প্রেরীত রসুল হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক''।

''ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল্লাজী খলাক্ব''

''পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন''।

আদর্শ ছাত্র জীবন বর্তমান মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা, মনসংযোগ আত্মবিশ্বাস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের ছোট অথচ অত্যন্ত ফলপ্রসু দিক নির্দেশ। বেশির ভাগ অভিভাবক অভিভাবিকা, শিক্ষক শিক্ষিকা বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার জগতে নানা সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষের জীবনেই যে কোন কাজে বা উন্নতির পথে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি আসে। কেও কেও সেই বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় আবার কেও কেও বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে থেমে যায়। যাদের ধৈর্য্য বেশি তারা থামে না যাদের ধৈর্য্য কম তারা থেমে যায়।

কোন সমাজ দেশ বা জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হলে কোনো দেশ বা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হয়, ফলে মনের স্তর উন্নীত হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হয়। প্রকৃত শিক্ষার ফলে মানুষের রুচিবোধ পরিবর্তিত হয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীর আচরন সমূহ কেমন হওয়া উচিত তা নিম্নে আলোকপাত করা হল —

১) শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ- রসুল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান প্রদর্শন করে না এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা রাখে না সে আমার উম্মতের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত নয়। উক্ত হাদীস দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা করা আশু কর্তব্য।

২) সুন্দর কথাবার্তা ঃ- আল্লাহ পাক বলেন ''মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলো''। (সুরা বাকারাহ-৮৩) উক্ত আয়াতপাকের মাধ্যমে ছোট বড় সকলকেই কথাবার্তার মাধ্যমে সুন্দর হওয়ার প্রতি সচেতন হতে হবে।

৩) বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার ঃ- রসুল (সাঃ) বলেছেন, ''মুসলিম একমাত্র ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ''। (বুখারি শরীফ) তাই আমার মুসলমানের উচিত মুখের ভাষা এবং মারামারি থেকে নিজেকে বিরত রাখা। অনেক সময়েই দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত কটুবাক্য এবং মারামারি। ছাত্রছাত্রীরা এই হাদীস অনুযায়ী অনুশীলন করলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

৪) সত্যবাদীতা ঃ- মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ''হে ঈমানদারগণ, তোমার আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাবাদীদের সঙ্গে থাকো''। (সুরা তাওবা-১১৯) রসুলে কারিম (সঃ) বহু হাদীসে সত্যপথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করেছেন। 'মিথ্যাকে সমস্ত অপরাধের মা' বলে অভিহিত করেছেন। তাই সকল মুসলমান তথা ছাত্রছাত্রীকে সত্যকে আঁকড়ে ধরার এবং মিথ্যাকে বর্জন করার কঠিন অনুশীলন করতে হবে।

৫) বিনয় ও নম্রতা ঃ- মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''রহমানের বান্দারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলা ফেরা করে।'' (সুরা ফুরকান) আরো অসংখ্য কোরানের এবং হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী ঈমানদারদের বিনয়ী ও নম্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শৈশবেই উক্ত গুন ধারনের অনুশীলনে সক্ষম না হয় তবে সামাজিক মানুষ হিসাবে কখনওই গড়ে উঠবে না।

৬) লজ্জা ঃ- রসুলে কারিম (সঃ) বলেছেন, ''লজ্জা কল্যান ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।'' (বুখারি ও মুসলিম) একমাত্র লজ্জাই এমন একটি গুন যা থাকলে বহু অপরাধের মাত্রা কমাতে সক্ষম। নিলর্জ্জতা মানুষকে সীমাহীন অপরাধের স্তুপে দাঁড় করায়। বিধায় লজ্জাশীলতায় উৎসাহ দেওয়া আমাদের আশু কর্তব্য।

৭) শিক্ষকের হক ঃ- রসুল পাক (সঃ) বলেন দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পদ গৌরব লোভনীয় নয়। তা হল ১) যাকে আল্লাহ পাক ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে খরচ করার ক্ষমতা দিয়েছেন ২) ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক বিদ্যা দান করেছেন এবং সেই অনুসারে সে কাজ করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়। শিক্ষকের হক অনেকটা পিতার ন্যায়। শিক্ষক হল রুহানী পিতা, তাই পিতার ন্যায় শিক্ষকের হক তাঁর মৃত্যুর পরেও বহাল থাকে। এই জন্যই শিক্ষকের মৃত্যুর পর সব সময় তার জন্য দোয়া করা কর্তব্য। যেহেতু তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেই শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। যাদের থেকে দ্বীনী মাসলা মাসায়েল তথা ইসলামী শারাহ শারীয়াতের শিক্ষা নেওয়া হয় তাদেরকেও শিক্ষক বলে। এবং যাদের লিখিত দ্বীনী বইপত্র পড়ে জ্ঞান অর্জনকারি বা উপকৃত হই নিয়ম অনুযায়ী উক্ত বইপত্রের লেখকগনও আমাদের শিক্ষক হয়। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি আখতারুজ্জামান তাঁর নিজস্ব ভাষায় তাই বলেন -

শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি সে তো কোন ছার
ভয় করি নাকো, ধারি নাকো ধার
মনে আছে মোর বল,
আজহতে চির উন্নত হল শিক্ষা গুরুর শির।

তাই মহান আল্লাহ পাক বলেন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? (সুরাজুমা আয়াত - ০৯)

পরিশেষে বলবো স্বল্প পরিসরে চরিত্রের মতো বিশাল বিষয় নিয়ে লেখা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। চরিত্রের বিভিন্ন দিক রাগ, লোভ, লালসা, নম্রতা, ভদ্রতা, লজ্জা সমস্ত বিষয়েই ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিতে শিক্ষক অভিভাবকসহ সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। তবেই আমরা একটি সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারবো — ইনশা আল্লাহ। তাই একটি ছাত্রছাত্রীকে আদর্শবান হতে হলে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বুদ্ধিমত্তা ও শালীনতার সহিত কথা বলা ও কাজ করা। প্রতি কাজকে বুঝিয়া শুনিয়া বিচক্ষনতার সহিত আঞ্জাম দেওয়া এবং ভালো কাজের আদেশ করা, খারাপ কাজের নিষেধ করা ও বড়দের প্রতি সম্মান করা ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া। প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সঃ) বলেন সব থেকে উত্তম দান হল কোন মুসলমান নিজে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে পরে তা অন্য কোন মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়। (ইবনে মাজা)

MONEY

ARIF ARMAN MOLLICK
CLASS - VIII

Money can buy a bed but not Sleep
Money can buy books but not Brain
Money can buy food but not Appetite
Money can buy medicine but not Health
Money can buy house but not Home
Money can buy luxuries but not Culture
Money can buy amusement but not Happiness
Money can buy Cosmetics but not Beauty
Money can buy sanctuary but not Sanctity
Money can buy servants but not Friends
Money can buy lust but not love
Money can buy books but not Readers
Money can buy status but not Nobility
Money can buy service but not Loyalty
Money can buy man but not God.

শিক্ষকদের প্রতি

সামসুল আলম সরদার
দ্বাদশ শ্রেণী

ছাত্ররা আজ আসবে স্কুলে।
আপনাদের জন্য গাইবে গান।।
আবৃত্তি আর বক্তৃতা দিয়ে।
আপনাদের জানাবে সম্মান।।
আপনাদের দেখে মোদের চলা।
স্বপ্ন ভবিষ্যতে।।
মানুষ গড়ার কারিগর তাই।
আগামী পৃথিবীতে।।
যত দোষ ত্রুটি ভুলভ্রান্তি।
সবই মার্জনা করে।।
মোদের জীবন গড়ে তোলেন।
সন্তান সম করে।।
তাইতো আপনাদের কথায়।
ভরে ওঠে প্রাণ।।
চিরউজ্জ্বল শিক্ষক আপনাদেরই।
জানাই হাজার সম্মান।।

শিক্ষক

মোঃ ইসমাইল মণ্ডল
হোস্টেল-শিক্ষক সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

শিক্ষক মানে মনের মধ্যে শিক্ষা আছে যার;
কর্তব্য আর ক্ষমার সমাহার।
শিক্ষাদানে যার সদা ব্যস্ততা;
পিতার পরে দ্বিতীয় পিতা মাতা।
যিনি সমাজের বন্ধু ও পথপ্রদর্শক,
সমাজ গঠনের চাবি হলেন শিক্ষক।
যাঁর জীবন আদর্শ ও অখন্ড।
তিনিই আবার জাতীর শক্ত মেরুদন্ড।
যিনি হলেন আলোর দিশা অন্ধকারে,
আদর্শ তিনিই সমাজ সংস্কারে।
সমাজের কাছে প্রতিনিধি তিনি সচেতন কষ্টি পাথর,
মোদের কাছে তিনিই হলেন খাঁটি পরশ পাথর।

ঈদের খুশি

ইয়াসমিনা খাতুন
দশম শ্রেণী

ঈদ মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব, অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে এই উৎসব প্রতিটি মুসলমান ঘরে পালিত হয়। ঈদ বছরে দুবার আসে — ঈদ-উল-ফিতর, ইদুজ্জোহা বা বকর ঈদ। প্রতি বছর এই ঈদউল-ফিতর অনুষ্ঠানের আগের মাস প্রত্যেক মুসলমান সম্প্রদায় সারাদিন আহার না করে জল না খেয়ে উপবাস বা রোজা রাখেন। রাত্রে তারা আহার করে পরম নিষ্ঠার নামাজ পড়ে কোরআন পাঠ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। মাসের শেষে ঈদের চাঁদ দেখে রোজা শেষ হয়। পরদিন হয় ঈদ, প্রতিটি মুসলিম পরিবার এই দিন আনন্দে মেতে ওঠে। এই দিন ধনী ব্যক্তিরা গরিবদের দান করে। একমাস রোজা রাখার পর ঈদের দিন সকল পুরুষ মুসলমান মসজিদে বা ঈদ গাহে সমবেত হয়ে নামাজ পড়ে। নতুন পোশাক পরে সকলে আনন্দে মেতে ওঠে এবং নামাজ শেষে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। ঈদ মূলত মিলন ও আনন্দের উৎসব, পরস্পরকে সমস্ত শত্রুতা ও ভেদাভেদ ভুলে একাকার হয়ে যাওয়ার উৎসব। আরেকটি মুসলীম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল-উল-আজহা। আরবী নাম ঈদুল-উল-আজহা কুরবানির সাথে সম্পর্কিত যার অর্থ কুরবানীর ঈদ। কিছু দেশে ইদুল আযহা" ইদুজ্জেহা বা বকর ঈদ নামেও পরিচিত। নবী ইব্রাহিমের স্মরনে এই উৎসব পালিত হয়। পবিত্র মক্কার হজ যাত্রার সমাপ্তিকেও চিহ্নিত করে এই উৎসব। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা ঈদের নামাজের পর এই দিনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাগল ভেড়া, গরু, উট দুম্বা ইত্যাদি কুরবানী করে। সকালে সমস্ত মুসলমান গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করে, খোসবু মেখে ময়দানে গিয়ে জমায়তের সঙ্গে দু রাকত ইদুল আযহার ওয়াজের নামাজ আদায় করে। তারপর বাড়ি ফিরে আসে কোরবানী করে। কোরবানীর মাংস তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ গরীব মিসকিনদের আর একভাগ আপন আত্মীয়স্বজনদের ও বন্ধুবান্ধবদের, ও অবশিষ্ট একভাগ নিজের জন্য ভোগ করার বিধান আছে। চামড়া বিক্রির সমস্ত টাকাই গরীব দুঃখিদের দান করে দিতে হয়। এই উৎসব সবার হৃদয়ে নতুন উত্তেজনা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগায়। এই দিনে বিরাজ করে আনন্দ উল্লাসের পরিবেশ। ঈদুল আযহার ৯টি সুন্নাহ। সবথেকে গুরুত্ব পূর্ণ আমল তাকবীর, তাকবীর পাঠের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি সাধারণভাবে অর্থাৎ ঈদুল আযহার রাতে, দিনে সবসময় উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বেশি করে তাকবীর পাঠ করা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন তোমার জিলহজ্বের প্রত্যেকটি যার মধ্যে ঈদের দিনও সামিল আছে এই দিনগুলিতে তোমরা বেশি বেশি তাকবীর পাঠ করো। তাকবীর মানে আল্লাহ আকবর বলা, তাহলিল মানে লা-ইলাহা ইল্লাহ বলো তাহমাদ অর্থাৎ আল্লার প্রশংসা করা। তাকবীর ও তাহলীল ও তাহমীদ সবগুলোকে গাদিসে বিভিন্ন ভাষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো আব্দুর রাসুলুল্লাহ থেকে বর্ণিত আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া-লিল্লাহিল-হামদ। আর বিশেষভাবে ফজরে, যোহরে আসরে, মাগরিবে, এশাতে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আসতে আসতে আমরা তাকবীর পাঠ করবো। দ্বিতীয় আমল ঈদুল আযহায় ঈদের সামাতের আগে কিছু না খাওয়া। যারা কোরবানী করছেন না তারা ঈদুল আযহাতে ঈদের সালাত পড়ে এসে তারা খাবার গ্রহন করবেন এটা তাদের সুন্নাহ হবে। আর যারা কোরবানী করছেন তার জন্য উত্তম হবে কোরবানীর গোস্ত খাবার গ্রহন করা। তৃতীয় সুন্নাহ হলো যার যা পোশাক তার মধ্যে উত্তম পোশাকটি পরিধান করা সুন্নাহ এটি। চতুর্থ আমল ঈদ উপলক্ষ্যে

গোসল করা। আবদুল্লা ওমর (রাঃ) থেকে ঈদের দিন গোসল করা নিয়মটি প্রমানিত। এছাড়া গায়ে দুর্গন্ধ ও আরো কারণে গোসল করা সুন্নাহ। পঞ্চম আমল হলো ঈদের শুভেচ্ছা একে ওপরকে জানানো। মোমেনরা যখন ঈদের দিন সাক্ষাত হবে একে ওপরকে অভিনন্দন জানাবে। ষষ্ঠ আমল ঈদ উপলক্ষ্যে ঈদগাহে যখন আমরা সালাত আদায় করতে যাবো তখন পায়ে হেঁটে যাবো। বাইক বা অন্য কোনো যানবাহনে চড়ে না যাওয়া এটি সুন্নাহ। সপ্তম আমল হলো ঈদগাহে যাওয়ার সময় এক রাস্তায় যাওয়া অন্য রাস্তায় আসা যদি একাধিক রাস্তা না থাকে একাপাশে যাওয়া একপাশে আসা এটি উত্তম একটি সুন্নাহ। অষ্টম আমল হলো ঈদের সালাত মসজিদে না করে অন্য কোনো জায়গায় পরা ময়দানে ইত্যাদিতে করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ অথচ আমাদের সমাজে বিলুপ্তির পথে। শহরে মাঠ ও ময়দান বেশি নেই তাই সেই জায়গায় মসজিদে সালাত আদায় করা যাবে রাসূল (সাঃ) মসজিদে নবাবিতে নামাজ না পরে বাইরে নামাজ পড়েছেন। নবম আমল হল ঈদ উপলক্ষ্যে মেয়েদের ঈদগাহে নিয়ে আসা। এটি আমাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ একটি হাদিসে বর্নিত আছে ঈদুল আযাহা এবং ফিতর এই দুই ঈদে মেয়েদের ঈদগাহে নিয়ে আসা। যাদের কিছু সমস্যা তাদেরও যেন নিয়ে আসা হয়। তারা ঈদের সালাত পড়তে পারবেন না কিন্তু তারা মোমেনদের মধ্যে থেকে তারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করবে। ঈদুল আযহায় ৪টি বিষয় ভুলেও করা যাবে না। অনেকে মনে করেন ঈদের দিন কবর জিয়ারত করা সুন্নাহ। এই ধারনা থেকে বেরিয়ে আসুন। এটি সুন্নাহ নয় এই কাজটি কখনোই করবেন না। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হলো আমরা অনেকেই ঈদের সালাতের পরে মুআনাকা করি কাঁধে কাঁধে মিলায় বা মুআনাকা এটি ঈদের কোনো সুন্নাহ নয়। অনেক দিন পর কারোর সাথে দেখা করলে আলাদা কথা। ঈদের দিন করা নিষিদ্ধ। তৃতীয় হল ঈদের দিন রোজা রাখা। ঈদের দিন খাদ্য গ্রহন করতে হবে কোনো রোজা রাখা যাবে না। চতুর্থ নিষিদ্ধ ফরাজ হলো ঈদের দিন যারা গান বাজনা শোনেন বা সবাইকে শোনান। এটি নিষিদ্ধ কাজ এটা করা যাবে না।

সম্প্রীতি

নিশাত তাসনিম

চতুর্থ শ্রেণী

হিন্দু ও মুসলিম মোরা একে অপরের ভাই ভাই
এই ভারতে অটুট হয়ে টিকে থাকতে চাই।
মানুষ হয়ে জন্মেছি মোরা এই ভারতে
কার এত সাহস হল বলল বিদেশে যেতে
ভারত আমাদের জন্মভূমি, ভারত আমাদের দেশ
এই দেশেতেই মরব আমরা এই কথাই শেষ।
মানুষ আজ হারিয়েছে তার মনুষত্য
ভুলে গেছে মানবতা একথা ও সত্য,
পরিশেষে বলি ভাই সব এক হয়ে যাও,
সব ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাধ মেলাও।

চলো করি পরিবেশ রক্ষা

রূপসা খাতুন

চতুর্থ শ্রেণী

প্লাস্টিক আমরা
ব্যবহার করি
ডাস্টবিনে না ফেলে
হেথা সেথা ফেলি
হয় ক্ষতি পরিবেশ
আর জগতের
মাটিতেও হয় ক্ষতি
আর জলজীবের।
এসো ভাই সবে মিলে
প্লাস্টিকে টানি ইতি
এতেই হবে পরিবেশ রক্ষা
আর হবে না ক্ষতি।

মোবাইল

সেখ মিজানুর আলি
অষ্টম শ্রেণী

বাচ্ছারা ফোন দেখলে নিশ্চুপ হয়ে যায়
ঘন্টার পর ঘন্টা তারা মোবাইলের পাতায়।
আসে নাকো ঘুম চোখের পাতায়
পড়াশোনা আসে নাকো মনের খাতায়।।
সময় চলে যায় কী করে কোথায়,
খাওয়া দাওয়া কথাটি ও ভুলে যায় প্রায়।
এযেন শরীরের কোনো এক ঠাঁয়,
মোবাইল ছাড়া বদ মেজাজী হয়ে যায়
নিজেকে স্থির রাখতে কভুনা পারা যায়।।
বাস্তব থেকে সরে যায়,
কোথায় সে জগৎ কভু কোথায় মনে হয়
হাতের কাছে চাইলে সব কিছু নাহি পাওয়া যায়।।
এ এক অদ্ভুৎ যন্ত্র,
মনকে করে দেয় মন্ত্র।
আমরা সবাই তাকিয়ে থাকি বোকা,
ভবিষ্যত প্রজন্মকে দিচ্ছে ধোকা
মানুষগুলি হয়ে গেছে একা।।
হয়তো আছে সুফল কিন্তু, কুফলেরই ভাষা
আমাদের জীবনকে করে তুলেছে সর্বনাশা।
সভ্য সমাজ কি করে হবে মোদের আশা;
পেট না ভরলেও রিচার্জে ঠাসা।।

নদীনালা - গাছপালা

সওবিয়া তানঈম
অষ্টম শ্রেণী

শুকিয়ে যাচ্ছে নদীটি আর
ভরাট হচ্ছে নালা
নির্বিচারে কাটছে সবাই
চারিদিকে গাছপালা।
এরকম চলতে থাকলে
হঠাৎ দেখবে তুমি
দেশটা হয়ে উঠেছে এক
শুকনো মরুভূমি।
জল না পেয়ে ছটফটিয়ে
মরবে মানুষ আর
বৃক্ষ বিহীন বিশ্বে সবাই
করবে হাহাকার।
কিন্তু ওদের রক্ষা করতে
এগিয়ে যদি আসো
নদীকে আর গাছপালাকে
একটু ভালোবাসো,
তবেই নদী চিরটাকাল
বইবে কলস্বরে
বৃক্ষলতাও বিশ্বভুবন
রাখবে সবুজ করে।

পৃথিবী পরকালের কর্মক্ষেত্র

সেখ বাসির আলি

হোস্টেল-শিক্ষক সীতাপুর ইণ্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

আমরা জগৎবাসী। এই জগতে কেহ আস্তিক কেহ বা নাস্তিক। আস্তিকরা আবার হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান..... ইত্যাদি নানাধর্মে বিভক্ত।

আমরা বাংলা, ইংরাজী,আরবী, উর্দু ইত্যাদি নানা ভাষায় কথা বলি। ভারত,পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি নানাদেশে বসবাস করি আমরা সকল জনসাধারণ।

আমরা শিক্ষিত,অর্ধশিক্ষিত বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কর্মঠ ও অলস ভাগে বিভক্ত।

রাজা, প্রজা, শাসক শাসিত সকলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, দেশ রাজ্য, রাষ্ট্র।

আমরা সুখ চাই, শান্তি চাই এবং এজন্য আমরা বিভিন্ন কাজ, পেশা অবলম্বন করে থাকি এবং feed back বা ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আমাদের সফলতার উদ্দেশ্যে জ্ঞানী, গুনী, বিজ্ঞজন স্বীকৃত, সকলের সেরা মানব জাতীর পথপ্রদর্শক হজরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরম বানী ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন — ''আদ্ দুনিয়া মাযরে আতুল আখেরাত।'' পৃথিবী হল পরকালের কর্মক্ষেত্র। অর্থাৎ এই জগৎটা হল কাজের জায়গা, বিশ্রামের আবাসস্থল নয়।

সুতরাং আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ কর্ম করে জীবন অতিবাহিত করবো। জীবন শেষে কর্মের ফসল পাবো। তখন শান্তি অথবা শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে। এককথায় আখেরাতের ভালোমন্দ নির্ভর করে দুনিয়ার কাজকর্মের উপর।

দুনিয়া আরবী শব্দ, এর বাংলা পৃথিবী, পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এখানের সকল কিছুই অস্থায়ী। এখানে সব কিছুর নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারিত। আবার সময়সীমা সকলের জন্য সমান নয়। এক একটার স্থায়িত্ব এক এক রকম। সময় শেষে সকলেই পরলোকগত হয়ে যায়। কেউ ইতিহাসের পাতায় মানবের মনে স্থান পায়। কেউবা অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। কেউ তার কথা মনে রাখে না।

এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আমি, আপনি, আমরা সকলে আমাদের নির্দিষ্ট জীবন সময়ে সত্য, সভ্য পবিত্র কাজ করে আমাদের পরকালের জীবনকে সুন্দর শান্তিময় করে তুলবো এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য হবে বা হওয়া উচিত। আমরা যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এই জগতের সকল কিছু সৃষ্টিকর্তা মানুষের মঙ্গল কামনায় সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্মরনার্থে। মানুষ সব কিছু ভোগ করবে, সকল কিছু থেকে উপকার নেবে আর সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে লিপ্ত থাকবে। এটাই তাঁর আদেশ।

অনুগত অবাধ্য সকলের জন্য তিনি বাতাস, বৃষ্টি, সূর্যকিরণ ইত্যাদি সমভাবে বন্টন করে দিয়েছেন কিন্তু আফসোস মানুষ বড় স্বার্থপর বড়ই কৃপন। মানুষ তাঁর দেওয়া সবকিছু ভোগ করে অথচ তাকেই ভুলে যায়। তাঁকে স্মরণের সময় সে পায় না। যদিও সকলে এমন নয়। তবুও শতকরা হিসাবে অবাধ্যের সংখ্যাই বেশী। এখানে প্রশ্ন আসবে তিনি তো সকলকে সমান শক্তি, সম্পদ, মেধা দেননি। তিনি এমন কেন করলেন? সকলে সমানভাবে ডাকবে কেন?

এর উত্তরে বলতে হয় এসব তারতম্যের মাধ্যমে তিনি মানুষের পরীক্ষা নেন। কে তাকে স্মরণ করে?

কে বিস্মৃত হয়ে যায়? কে ধৈর্য্যশীল? কে চরম অধৈর্য? কে শক্তি সম্পদ মেধার মালিক হয়ে জনগনের সেবায় আত্মনিয়োগ করে জনগনের মাঝে তাকে সন্ধান করে? কে চরম দারিদ্রতায় পড়েও চৌর্য বৃত্তি থেকে পরম ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়? কে অত্যাচারকে অপছন্দ করে? কে বোবার নীরব কান্নায় ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তাঁর সমব্যথী হয়ে ওঠে? কে ধনের মোহে পরে তাঁকে ভুলে যায়? কে সম্পদ হারিয়েও তাদের আঁকড়ে ধরে। এককথায় কে তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করে সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে স্মরন করে — এটা তিনি কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেন।

সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আমরা যেন ভুলে না যায় ''তিনি খালেক আমরা মাখলুক।'' তাঁকে বোঝার জন্য, তাঁর অনুগ্রহ পাবার জন্য তিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। পাঠিয়েছেন মহামানব মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে। আমরা যেন সেই কোরআন অনুসরন করে; মহানবীর আদর্শ বাস্তবায়িত করে, আখেরাতের শান্তির জন্য দুনিয়ার জীবনে যথাযথ কর্মপালন করি।

আখেরাত হল পরকালীন জীবন। পার্থিব জীবনের পরের জীবন। পার্থিব জীবনের ক্রিয়া কর্মাদির ফলাফল প্রাপ্তির জীবন। এ জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর পর থেকে। এ জীবনের সমাপ্তি নেই। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই জীবনে কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না। সৃষ্টিকর্তার অনুমতি ব্যাতিরেকে কেউ কারো জন্য সুপারিশ ও করবে না। এই জীবনে কোন কর্ম নাই। এখানে আছে শুধু প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি নির্ভর করে দুনিয়ার কর্মের উপর। দুনিয়ার কর্ম যদি স্বচ্ছ হয়, সৎ হয়, সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ মোতাবেক হয়, নবীজীর ঘোষণা — অনুরূপ হয়। তাহলে শুধু সুখ উপভোগ, যার কোন শেষ নাই। নতুবা যন্ত্রনার চরম ভোগান্তি যার কোন বিরতি নাই, চিরকালীন ব্যবস্থা। এখানে সুখ-শান্তি অথবা দুঃখ যন্ত্রনা পার্থিব কোন কিছু উপমা দ্বারা বর্ণনা অসম্ভব। এটা বিশ্বাস। যারা এই বিশ্বাসে দোদুল্যমান তারা বিরুদ্ধবাদী অসত্যের পূজারী, তাদের যতই বোঝাও, উপদেশ দাও উপমা দাও তারা শয়তানের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারে না, হতেও চায়না।

তাদেরকে আমার একটা জিজ্ঞাসা আচ্ছা বলোতো —

মৃত্যুকে কি করেছে জয়
কে হয়েছে চিরজীবি এই জগতে?
আকাট মুর্খ কিংবা মহাজ্ঞানী
কে মরেনি এই ধরনীতে?
তবুও তোমার অবিশ্বাস
কে পারে তোমায় বোঝাতে?

চলে গেছে সবাই সকলে, যাবো আমিও, সেও থাকবেনা যে আসবে পরে। ধন্য সেজন যে জন মহামানব মহানবীর পথ ধরে জীবনে কিছু পূণ্য সঞ্চয় করে। ব্যর্থ সে জীবন, যে জীবন কর্মবিমুখ, অলসতায় ভরা। জানি ঘুম ভালো কিন্তু ভালো নয় ঘুমের ভান করা। উপদেশ দানের যোগ্য নয় গো আমি সামান্য কিছু পরামর্শ। সুখ পাবে, পাবে শান্তি যদি ধরতে পারো মহানবীর আদর্শ। আমি সেখ বাসির আলি তোমাদেরই একজন ভুল হলে করিও ক্ষমা, দোওয়া দানে ধন্য করিও মোর এই ক্ষুদ্র জীবন। নিবাস জঙ্গল সুফি, জেলা - হুগলী, জাঙ্গীপাড়া থানাতে। হে খোদা ব্যথিত যেন না হয় কেহ মোর এই লেখাতে।

কাবার মাওলা

সেখ রিফাজ আহমেদ
ষষ্ঠ শ্রেণী

কাবার ঘরের মাওলা তুমি
রহিম রহমান
হচ্ছে যেথা দিবা নিশি
তোমার তারিফ গান।
নবী ও সিদ্দিক অলী ও দরবেশ
এখানে পাইলে খুঁজি
মাওলা ওগো আল্লাহ ওগো
তোমার প্রেমের পুঁজি
দয়াল প্রভু দয়া করে
এসাধ মিটাও মোরে
আমি যেতে চাই সে দ্বারে
যেতে চাই সেই সে ঘরে।
যেথা এলে ঘোচে পাপ
তুমি খোদা করো মাফ।
যেথা পাপ পত্র হয়ে ঝরে
ডেকে নাও সে দ্বারে
কাবার প্রভু কাবার পথে
যাত্রী আমায় করো
এই কামনা তোমার কাছে
পথটি আমায় করো সহজতর।

একদিন

মহাম্মাদ সামিরুল মল্লিক
অষ্টম শ্রেণী

হিম কালে আমার গায়ে থাকে একটি চাদর
পেয়ারা গাছে ছিল একটি লাল মুখো বাঁদর,
হাজার হাজার ফুল
দেখতে করি ভুল।
পাশে ছিল একটি বড়ো পুকুর
পুকুরের পাড়ে ছিল একটি কুকুর,
দেখতে পেয়ে ডাক দিলাম তাকে
কুকুর এসে ভরষা দিল আমাকে।
তার পরেতে পেয়ারা পেড়ে খাই
খাওয়া হলে মাঠে খেলতে যাই,
খেলতে এলো আরও বন্ধু পাঁচজন
সবাইকে নিয়ে ভরিয়ে নিলাম মন।
খেলা হলে বাড়ি ফিরে যাই
বাড়িতে এসে দেখি কেউ নাই
এমন সময় ভাবি কি করি
বইটা নিয়ে বসে শুধু পড়ি।

মাসজিদুল আক্বসার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

এন্তাজুল ইসলাম রহমানী
হোস্টেল-শিক্ষক, সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা

মাসজিদুল আক্বসার পরিচয়, গুরুত্ব ও মহত্ব —

মুসলমানদের অনেক স্মৃতি বিজড়িত মাসজিদ হল আল-আক্বসা। মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নবাবীর পর তৃতীয় গুরুত্বপুর্ণ মাসজিদ হল মাসজিদুল আক্বসা। এটিই পৃথিবীর বুকে নির্মিত দ্বিতীয় মাসজিদ। ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত এই মাসজিদের সঙ্গে মুসলমানদের বহুকালের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মুসলমানদের প্রথম কিবলাহ কা'বা হলেও মাসজিদুল আক্বসা স্থাপনের পর এটি কিবলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সেই সুবাদে এটাকে প্রথম কিবলা বলা হয়ে থাকে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর (দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে) আবার কা'বাকে ক্বিবলাহ স্থির করা হয়। হিজরতের পর প্রায় ১৭ মাস মুসলমানরা মাসজিদে আক্বসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। মে রাজের রাতে রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে মাসজিদুল আক্বসায় গমন করেন। যা ক্বুরআনুল কারীমে এভাবে উল্লেখ আছে — ''তিনি মহা মহিয়ান যিনি তার বান্দাকে মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্বসা পর্যন্ত নৈশ ভ্রমন করিয়েছেন। আর যিনি তার (আক্বসার) চতুর্দিক বরকতময় করেছেন"। (সুরা ইসরা, আয়াত-১)।

মাসজিদে আক্বসার গুরুত্ব সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ''মাসজিদে হারামে এক নামাজ এক লক্ষ নামাজের সমান, আমার মাসজিদে (মাসজিদে নবাবী) এক নামাজ এক হাজার নামাজের সমান আর বাইতুল মাক্বদাসে এক নামাজ পাঁচশত নামাজের সমান"। (আহমাদ ১৪৬৯৪, ইবনে মাজাহ ১৪০৬)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্নিত রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন ''তিন মাসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মাসজিদে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) সফর করোনা। মাসজিদে হারাম, মাসজিদে আক্বসা ও আমার এই মাসজিদ (মাসজিদে নবাবী)"। (সহীহ বুখারী ১১৯৭, সহীহ মুসলিম ৮২৭ জামে তিরমিযি ৩২৬)

এছাড়াও ক্বুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় আল আক্বসাকে বরকতময় ও পবিত্র ভূমি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অসংখ্য নবী রসুলদের স্মৃতিধন্য এ পুর্ণভূমি দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসলিম শাসকদের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ধারন করে আছে আল-আক্বসার এই পূণ্যভূমি।

প্রায় চোদ্দো হেক্টর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত আল-আক্বসা কমপ্লেক্স। এটি কোনো একক স্থাপনা নয়। চার দেওয়াল বেষ্টিত এই কমপ্লেক্সে মাসজিদ সহ প্রায় দুই শত ছোট বড় স্থাপনা বয়েছে। মুসলিম শাসনামলে এখানে ছোট বড় অনেক মাসজিদ নির্মিত হয়েছে। তার মধ্যে কিবলি মাসজিদ, মারওয়ানী মাসজিদ ও মাসজিদে উমার হল অন্যতম।

মাসজিদুল আক্বসা নির্মানের ইতিহাস —

পৃথিবীর বুকে নির্মিত দ্বিতীয় মাসজিদ হল মাসজিদুল আক্বসা। মাসজিদুল হারাম নির্মানের ৪০ বছর পর এই মাসজিদ নির্মান করা হয়। পরবর্তীতে অনেকবার এই মাসজিদ ধ্বংস হয় আবার তা পুনঃনির্মানও করা হয়। তবে কে সর্বপ্রথম এই মাসজিদ নির্মান করেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক মত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে

এই মাসজিদের মূল নির্মাতা হলেন হযরত আদম (আঃ)। কেউ কেউ নূহ (আঃ) এর পুত্র সামকে এই মাসজিদের আদি নির্মাতা বলে আখ্যায়িত করেন।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এই মাসজিদের প্রথম নির্মাতা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তবে আধুনিক গবেষকদের মতে হযরত আদম (আঃ) হলেন এই মাসজিদের প্রথম নির্মাতা। হযরত নূহ (আঃ) এর সময়ে প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই মাসজিদ পুনঃনির্মান করেন। কালের আবর্তনে দাউদ ও সুলাইমান (আঃ) সহ অনেক নবী রসুলগণ এই মাসজীদের সাংস্কার কার্য সম্পাদন করেন। এই মাসজিদ নির্মানের ইতিহাস সম্বন্ধে হাদিস শরীফে বর্নিত হয়েছে হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ''হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) পৃথিবীতে সর্ব প্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন মাসজিদে হারাম। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তারপর মাসজিদে আক্বসা। আমি বললাম, উভয় মাসজিদের (তৈরির) মাঝে কত (বছরের) ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের''। (সহীহ বুখারী ৩৩৬৬) এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাসজিদে হারাম নির্মিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর মাসজিদে আক্বসা নির্মিত হয়।

হযরত সুলাইমান (আঃ) আল-আক্বসা চত্বরে একটি অলীশান ভবন নির্মান করেন। যেটাকে 'হায়কালে সুলাইমানী' বলা হত। পরবর্তীতে ইহুদীরা এটাকে তাদের উপাসনালয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারা এর নাম দেয় 'সলেমন ট্যাম্পল'। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে 'বুখতে নাসর' এই ভবনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং নবীদের স্মতি স্মারকগুলো লুট করে নিয়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮০ সালে তৎকালীন ইরানের সম্রাটের সাহায্যে ইহুদীরা আবার মাসজিদুল আক্বসার দখল নেয়। আবারো তারা 'সলেমন ট্যাম্পল' পুনঃনির্মান করে এবং তার নাম দেয় 'সেকেন্ড ট্যাম্পল'। এই ঘটনার ৯৮ বছর পর গ্রিক সম্রাট অ্যারোটেনিস গোটা ফিলিস্তিন দখল করে সলেমন ট্যাম্পলকে গ্রীক উপাসনালয়ে পরিনত করে। পরবর্তীকালে তৎকালীন রোম সম্রাট কনস্টান্টিনোপল খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে জেরুজালেমে খ্রিষ্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় তারা এখানে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় অভিশপ্ত ইহুদী জাতি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। আধুনিক ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ভূমিহীন ছিল।

মুসলিম শাসনামলে মাসজিদুল আক্বসা —

মে' রাজের রাতে রসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর আলআক্বসায় গমনের মধ্য দিয়ে সেখানে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের সূচনা হয়। পরে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ) ফিলিস্তিন বিজয় করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মান করে যার নাম মাসজিদে উমার। এর পর ৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সেখানে অষ্টকোনাকৃতির ঐতিহাসিক 'ক্বব্বাতুস্ সখরা' বা সোনালী গম্বুজ নির্মান করেন। উমাইয়া শাসনামলে ইসলামের এই অন্যতম স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আল-আক্বসা চত্বরে বেশ কিছু মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উমাইয়া শাসকদের মত আব্বাসীয়রা আল-আক্বাসার পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। তাদের সময়েও আল-আক্বাসার প্রভূত সংস্কার হয়। কিন্তু রাজধানী বাগদাদ থেকে ফিলিস্তিনের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে কিছু শিথিলতা আসে। এই সুযোগে কুচক্রী শিয়া ইসমাইলী গোষ্ঠী ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। প্রায় একশত বছর আল-আক্বাসা তাদের অধীনে থাকে। এ সময় ভ্রান্ত শিয়া মতবাদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় আল-আক্বসা। পরবর্তীতে সেলজুক সুলতানরা আল-আক্বসা পুনরুদ্ধার করেন এবং বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবধারার প্রচলন করেন।

মাসজিদুল আক্বসার বেদখল হওয়া ও তার পুনরুদ্ধার —

১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম সহ গোটা সিরিয়া দখল করে নেয়। পবিত্র আল-আক্বসায় দখলদারিত্ব ঘটিয়ে সেখানে তারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। মাসজিদ গুলির কোনোটিকে গির্জা ও কোনোটিকে আস্তাবলে পরিণত করে। প্রায় ৯০ বছর আল-আক্বসা মুসলমানদের থেকে বেদখল ছিল। পরবর্তীতে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর, শুক্রবার সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-আক্বসা উদ্ধার করেন। এ সময় সুলতান সালহুদ্দীন আইয়ুবী বিজয়ের স্মৃতি স্মারক হিসেবে একটি মিম্বার নির্মাণ করেন। আল-আক্বসায় আবারও মুসলমানদের নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয় এবং তা পুনরায় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পিঠস্থানে পরিণত হয়।

দীর্ঘদিন মামলুক সুলতানদের নিয়ন্ত্রনে থাকার পর ষোলো শতকের গোড়ার দিকে আল অক্বাসা উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রনে আসে। তৎকালীন উসমানীয় শাসকরা মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নাবাবীর মতোই আল-আক্বাসার রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ তৎপর ছিলেন। উসমানীয় খিলাফাত বিলুপ্তির (১৯২৪) পর আবার আল-আক্বসার উপর নেমে আসে নতুন দূর্যোগ। এটি জর্ডান শাসকদের কর্তৃত্বে চলে যায়। তবে মুসলমানরা সেখানে নির্বিঘ্নে ইবাদাত বন্দেগী করতে পারত।

আধুনিক যুগে মাসজিদুল আক্বসার অবস্থান —

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে আরব-ইসরাঈল ছয় দিনের যুদ্ধে আরব পরাজিত হলে আল-আক্বসা সহ পূর্ব জেরুজালেম ইসরাঈলের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। এ সময় আল-অক্বসা কমপ্লেক্সে ইসরাঈলের নিয়ন্ত্রনে থাকলেও মাসজিদ পরিচালিত হয় একটি ওয়াকাফ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে। যদিও প্রবেশপথ গুলিতে মোতায়েন করা থাকে ইহুদী দখলদার সেনা। তারা অনেক তল্লাসীর পর মুসল্লিদের মাসজিদে প্রবেশ করতে দেয় মুসলমানদের পাশাপাশি ইহুদী বা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদেরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও মাসজিদের ভিতরে প্রবেশ করার বা সেখানে প্রার্থনা করার অনুমতি ছিল না। ইসারাঈলের উগ্র ইহুদীবাদী গোষ্ঠী সর্বদা এর বিরোধীতা করে এসেছে। তারা আল-আক্বাসা মাসজিদ ভেঙে সেখানে তাদের ধর্মীয় উপসনালয় নির্মানের দাবিতে সোচ্চার। ইসরাঈলী সরকার ও সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় এরকম গ্রুপগুলি মাঝেমাঝেই আল-আক্বাসা প্রাঙ্গনে গিয়ে তাদের দাবির পক্ষে প্রচার চালায় এবং মাসজিদের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে। অপরদিকে দখলদার ইসরাঈলী বাহিনী মুসলমানদেরকে আল-আক্বাসায় প্রবেশ বাধা প্রদান করে। শুধু রাজনৈতিক ভাবে ফিলিস্তিনীরা আল-আক্বাসার দাবিদার নয়। আল-আক্বসামুসলমানদের জন্য অত্যান্ত পবিত্র স্থান। তাই তার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনী মুসলমানরা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করে চলেছে। সেখানকার প্রতিটি শিশু জন্মের পর আল আক্বসা উদ্ধারের স্বপ্ন দেখে আসছে বহু দিন ধরে।

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসরাঈল আল-আক্বসা মাসজিদ প্রাঙ্গনের নিকটে একটি নতুন ট্যানেল খুললে ফিলিস্তিনী মুসলমানরা এটি তাদের পবিত্র স্থানের মর্যাদা লঙ্ঘন বলে আপত্তি তুললে ইসরাঈলী দখলদারদের রোষের মুখে পড়তে হয় এবং দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। এরপর আল-আক্বাসাকে কেন্দ্র করে একাধিকবার ইসরাঈলী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়।

২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসরাঈলী কর্মকর্তারা আল অকসায় মুসলমানদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করার অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিলে আবারও ইসরাঈলী বাহিনীর সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের সংঘর্ষ হয়। এই সময় ইসরাঈলী বাহিনি মাসজিদে আক্বসার ভিতরে টিয়ার গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড মোতায়েন করেছিল। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে ইসরাঈলকে নিন্দার

মুখে পড়তে হয়। এই ঘটনা ফিলিস্থিনীদের বিক্ষোভকে উস্কে দেয় এবং সংঘর্ষ অত্যান্ত ভয়ানক আকার ধারন করে। যা 'আল-আক্বসা ইন্তিফাদা' নামে পরিচিত।

২০২১ সালে দখলদার ইসরাঈলী সেনা বাহিনী ফিলিস্তিনের গাজায় হামলা চালালে ফিলিস্তিনীরা তা প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় গোষ্ঠির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে এবং তা যুদ্ধ পরিস্থিতির আকার নেয়। দশ দিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এতে একাধিক ফিলিস্তিনী নিহত ও আহত হন। ২০২৩ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আল-আকসা মাসজিদে প্রার্থনারত ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাঈলী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগন সহ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন 'হামাস' তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। আরব দেশ গুলোও এই হামলার সমালোচনা করে।

সম্প্রতি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে ইসরাঈলী উগ্র ইহুদীবাদীদের একাংশ প্রার্থনা করতে মাসজিদ এলাকায় প্রবেশ করে। সেই সময় কিছু ফিলিস্তিনী নাগরিক মাসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে ইসরাঈলী সেনারা তাদের উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন 'হামাস' অত্যান্ত ক্ষুদ্ধ হয় এবং তারা ৭ই অক্টোবর খুব তৎপরতার সঙ্গে দক্ষিণ ইসরাঈলে হামলা চালায়। এই হামলায় কয়েকশত ইসরাঈলী জঙ্গি সহ অনেক সেনা, পুলিশ ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এই হামলার প্রতিউত্তর দিতে আমেরিকার মদতে ইসরাঈল গাজায় হামলা শুরু করে এবং প্রচুর পরিমানে বোমা বর্ষন করে। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালে পর্যন্ত তারা বোমা বর্ষন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। প্রচুর পরিমানে ফিলিস্তিনী বেসামরিক নাগরিকের উপর হামলা চালায়। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়। তাদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি নারী ও শিশুরা পর্যন্ত। ইসরাঈলের এই লাগাতার হামলায় হামাস যোদ্ধা সহ বহু বেসামরিক নাগরিক শহীদ হন। ইসরাঈল ও হামাসের চলমান যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সিরিয়া, লেবানন এমনকি মিশর পর্যন্ত। আল-আক্বাসাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭ সালের পর থেকে এত ভয়াবহ যুদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি। প্রায় দেড় মাস লাগাতার যুদ্ধের পর অবশেষে ২৪ নভেম্বর থেকে ইসরাঈল ও হামাস চার দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ন করে। পরে তা ছয় দিন পর্যন্ত বর্ধিত হয়। স্বদেশের মাটিতে স্বাধীনতা ফিরে পেতে জানিনা আর কত নিরিহ ফিলিস্তিনী মুসলমানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। ফিলিস্তিনীদের জন্য স্বাধীন ভূখন্ডের আশায় আজও প্রহর গুনছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানবতাবাদী মানুষ। হে আল্লাহ! তুমি ভালো জানো এর সুরাহা কবে হবে, কবে আবার আল-আক্বসায় তোমার তাকবীর ধ্বনিত হবে। তুমি আল অক্বসা সহ ফিলিস্তিনী মুসলমানদের জান-মান, ইজ্জতকে রক্ষা কর। আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

নামাজ

সাবনাম খাতুন
অষ্টম শ্রেনী

আমি যখন ছোটো ছিলাম বয়স ছিল সাত
পিতা তখন আদেশ করেন ধরে আমার হাত।
বলেন তিনি ওজু করে মসজিদে চলো আজ,
এখন থেকে পড়তেই হবে তোমাকে নামাজ।
পিতার সাথে পোঁছালাম আমি মসজিদের ভিতরে,
দাঁড়িয়ে গেলাম নামাজ পড়তে ছোটোদের কাতারে।
অনেক সুরা অনেক দুআ আমার মুখস্ত আছে,
এইসব কিছু হয়েছিল আমার আম্মুজানের কাছে।
রোজ রাতে আম্মু আমায় শোনায় নবীদের ঘটনা,
তখন আমার কাজ হত সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা।
সেই যুগে কত কিছু ঘটত নবীদের মাঝে,
ঘটনাগুলিতে বেশিরভাগ নামাজের কথা আছে।
যখন আমার বয়স পৌঁছে গেল দশ বছরে,
পিতা আমায় একটি কথা বল্লেন নামাজের ব্যাপারে।
পিতা বল্লেন তোমার বয়স দশ বছর হয়ে গেছে এবার,
এখন থেকে নামাজ না পড়লে তুমি পাবেনা ছাড়।

মায়ের জীবন সার্থক

ইমামা পারভিন
নবম শ্রেণী

লাগিলো মনে ব্যথা
অনেক কষ্টে কহিল মাতা
লোকের গৃহের ভৃত্য হইয়া
শিখাইনু তোরে পড়ালেখা
তুই কিনা আজ মোরে
পাঠাইবি বৃদ্ধাশ্রমে!!
তোর বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া
নিতান্ত শিশু আর মাকে ফেলিয়া
সেই থেকে করিয়া এসেছি
লোকের গৃহের কর্ম।
তুই কিনা আজ হয়েছিস বাবু
শুধু আমি রয়ে গেনু অথর্ব
আজ আমি আনন্দে আত্মহারা
হইয়া যাইবো নতুন আশ্রম
মোর জীবন সার্থক করিয়া
মোরে চলিল লইয়া
মোর বাছা বৃদ্ধাশ্রম।।

মোবাইল

রাইসা নুজহাত
দশম শ্রেণী

তুমি আসার পর থেকে
মানুষ ভুলে গেছে চিঠি লেখাকে
মানুষ হয়ে গেছে অলস
তোমায় কাছে পেয়ে
তুমি এতটাই প্রিয়
তোমায় হারাতে মানুষ পায় ভয়।
কীভাবে হলে এতটা আত্মীয়?
তুমি তো একটি ছোট্ট যন্ত্র।
আজ ছেলে মেয়ের হাতে
বই খাতার পরিবর্তে
তোমায় নিয়ে মত্ত।
তুমি দূর দূরান্তের
খবর দাও পৌঁছে।
তবুও তুমি যন্ত্র।
যেদিন হও অচল
সেদিন তোমায় ছুড়ে ফেলে
আবার আসে কেউ সচল।
কিন্তু চিঠি সেতো চিরন্তন
মনের কথা গোছানো অক্ষরে
ভাবিয়ে তোলে কখনো অশ্রু জলে
ছিল আছে থাকবে আবহমান।

আদর্শ শিক্ষক

সামসুন নাহার
নবম শ্রেণী

শিক্ষক আমাদের শিক্ষা দাতা
পৃথিবীর গুপ্তধন।
তাদের দ্বারা আলোকিত হয়
এই ছাত্র জীবন।।
শিক্ষক ছাড়া ছাত্র সমাজে
নিরাশার জল ঝরে।
উদার মনে সমস্ত জ্ঞান
তারাই প্রদান করে।।
প্রকৃতভাবে শিক্ষক যাঁরায়
সেলাম জানাই আমি
তারাই শিক্ষক তারাই ওস্তাদ
সবার চেয়ে দামি।।
শিক্ষক দেখায় পথের দিশা
এই জগতের বুকে।
স্নেহ মায়া ভক্তি ছড়ানো
বাণী থাকে মুখে।।
তাদের চোখে সবাই সমান
আমরা শিক্ষক বলি যারে।
এই জীবনে গুরুজন সে
পিতা মাতার পরে।।

সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য নেয়ামত ঃ পানি

সেখ আব্দুল আজীজ আলআমান
সীতাপুর ইন্ডাওমেন্ট সিনিয়র মাদ্রাসা (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, সমস্ত প্রসংশা সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের, যিনি জমিন আসমানসহ সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। যার অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতিত কোনো জীবের পক্ষে এই পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র সময় বেঁচে থাকা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এর পরে পরেই জানাই আমাদের পেয়ারা নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) এঁর উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম। আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে প্রত্যেক জীবের জীবনধারনের জন্য আদর্শ পরিবেশ ও আদর্শ পরিকাঠামো হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি অসংখ্য নেয়ামাত আমাদেরকে দান করেছেন। যেগুলির বদৌলতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। আমরা সমগ্র জীবন ধরে যদি আল্লাহ তায়ালার এই নেয়ামতগুলির জন্য শুকরিয়া আদায় করি তবুও তা যথেষ্ট হবে না। বলা যায় নেয়ামাতগুলির শুকরিয়া আদায় করেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু দুঃখের কথা আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আল্লাহ তায়ালার নেয়ামাত গুলির শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মাজীদে অসংখ্য আয়াত পাক নযিল করেছেন। যেমন —**"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"** (সূরাহ্ আল বাকারা, আয়াত নং ১৫২) অন্যত্র সুরাহ ইব্রাহিম, আয়াত নং ৭ এ বলেছেন — **"তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"** (সুরাহ্ ইব্রাহিম, আয়াত নং ৭)

আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য নেয়ামাতগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ নেয়ামাতগুলির মধ্যে অন্যতম হল পানি। পানি হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেওয়া এমন এক নেয়ামাত যেটি ছাড়া কোনো জীবের পক্ষেই এই পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা জমীন আসমান সৃষ্টি করার পূর্বে পানি সৃষ্টি করেছেন এবং এই পানিকেই তিনি জীবন সৃষ্টির মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পানিকে শুধুমাত্র মানুষের পান করার জন্য জীবন ধারনের জন্যই সৃষ্টি করেননি। তিনি পানিকে করেছেন তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অর্থাৎ আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন মাখলুক সৃষ্টিতে পানি ব্যবহার করেছেন। এবিষয়ে তিনি পবিত্র কুর্আন মাজীদে সূরাহ্ নূর, আয়াত নং ৪৫ এ উল্লেখ করেছেন - **"আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে"।**

এছাড়া তিনি সূরাহ্ আম্বিয়া, আয়াত ৩০ এ বলেছেন -**"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে অকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।"**

আমার আলোচনার মূল বিষয় হল পানি। পানি কি ধরনের পদার্থ? পানির রাসায়নিক বিশ্লেষন, মানবজাতির জন্য পানির গুরুত্ব, মানব জীবনে পানির অভাব ও আধিক্যের প্রভাব, পানি পান করার সঠিক নিয়ম ও পরিমাপ, পানি পান করার সঠিক সময়, ভারি খাওয়ার পরপরই পানি পান করা উচিত কি না, পানির বিশুদ্ধতা পরিমাপ করার উপায়, বিশুদ্ধ পানি কীভাবে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্!

পানি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কতবড় নেয়ামত তা অনুধাবন করতে হলে পানি নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। পানি সম্পর্কে আল কুর্আনে অসংখ্য আয়াত পাক নাযিল হয়েছে। এই আয়াতপাক গুলোর দিকে একবার চোখ ফিরালেই বুঝতে পারা যায় পানি কত বড় নেয়ামত।

পানি সম্পর্কে আল কুর্আনের বিষ্ময়কর তথ্য ঃ-

মাখলুক সৃষ্টিতে পানি ঃ আগেই বলেছি আল্লাহ জমীন আসমান সৃষ্টি করার পূর্বে পানি সৃষ্টি করেছেন এবং এই পানিকে তাঁর যাবতীয় জীবন সৃষ্টির মূল উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেমনটা সূরা নূরা এর ৪৫ নং আয়াতে ও সূরা আল আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে তিনি এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন —

''আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে''। (সূরাহ্ নূর; আয়াত ৪৫)

''প্রানবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম''। (সূরাহ্ আম্বিয়া; আয়াত ৩০)

ইবাদাত বন্দেগিতে পানি ঃ আল্লাহ্ তায়ালা জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তিনি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেননি। যেমন এবিষয়ে তিনি আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন - **''আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে''।** (সূরাহ্ যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬)।

এই আয়াত পাক থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে, আমাদের ইহকালীন জীবনের মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্যই হল মহান আল্লাহপাক রব্বুল আলামীনের ইবাদাত কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশই পরকালীন মহাসফলতাকে গুরুত্ব না দিয়ে ইহকালীন জীবনকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি অথচ আল্লাহ তায়ালা এই পার্থিব জীবনকে 'ধোঁকার সামগ্রী' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন - আল্লাহ্ তায়ালা সূরাহ্ আল ইমরানে ১৮৫ নং আয়াতে বলেন —

''কেননা পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়''।

এবার আসি মূল বিষয়ে, আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন পবিত্র, তাঁর সকল ইবাদত পবিত্র এবং তাঁর সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য পবিত্রতা অর্জন অতীব জরুরি একটি বিষয়। যেটি ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক বিষয়ও। কেননা পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোনো ইবাদাতই গ্রহনযোগ্য হবে না। আর এই পবিত্রতা অর্জন পানির মাধ্যমে করার আদেশ করেছেন। কেননা পানি স্বভাবগত ভাবে পবিত্র। পবিত্র বিধায় তা পানের যোগ্য। পানি পবিত্র বিধায় অন্যকেও পবিত্র করে তোলে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুর্আন মাজীদে ঘোষনা করেছেন —

''তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষন করি''। (সুরাহ্ ফুরকান, আয়াত - ৪৮)।

পিপাসা নিবারনে পানি ঃ কথায় বলে সমগ্র পৃথিবীতে তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। আবার পৃথিবীর সমগ্র জলরাশিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা লোনা পানি ও মিঠা পানি। লোনাপানি পানের অযোগ্য এবং মিঠাপানি পানের যোগ্য। পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির মাত্র ১ শতাংশ পানি পানের যোগ্য বাদ বাকী ৯৯ শতাংশ পানি লোনা পানি বা পানের অযোগ্য। উভয় প্রকার পানি একইসাথে প্রবাহিত হলেও তারা কিন্তু একে অপরের সাথে মিশে যায় না। প্রত্যেকেই তাদের স্বতন্ত্রধর্ম বজায় রাখে। এখানেও রয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার বড়ই অনুগ্রহ ও দয়া। তিনি দুই

পানিকে একই সাথে প্রবাহিত করলেও তাদের মধ্যে রেখেছেন এক সুক্ষ অন্তরায় যেমনটা তিনি আল কর্‌আনে উল্লেখ করেছেন —

"দুটি সমুদ্রকে তিনিই প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয়"। (সুরাহ্ আর রহমান; আয়াত ১৯)

"কিন্তু তা সত্বেও উভয়ের মাঝে আছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না"। (সুরাহ্ আর রহমান; আয়াত ২০)

পৃথিবীতে পানের যোগ্য মিঠা পানির তুলনায় পানের অযোগ্য লোনাপানির পরিমান বহুগুন বেশি যেটা আগেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিঠা পানির অভাব অনুভূত হয়নি কারণ মহান আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন পানের অযোগ্য লোনা পানি থেকে পানের যোগ্য মিঠা পানি তৈরী হওয়ার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো তিনি সৃষ্টি করেই রেখেছেন এবং তৈরী হওয়া মিঠা পানিকে সংরক্ষন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য নদী, নালা, খাল, বিল সৃষ্টি করেছেন। এইবার বলি তিনি কি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন? সেটি হল সুর্যের কিরণের প্রভাবে সাগর মহাসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকার লোনা পানি বাষ্পাকারে আকাশে জমা হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। এখানে বলে রাখি সমুদ্রের লবন সমুদ্রেই পড়ে থাকে শুধুমাত্র পানি বাষ্পিভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহপাক রব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতি ক্ষমতায় সেই মেঘ থেকে মিঠা পানি আবার বৃষ্টিপাত হিসাবে ভুপৃষ্ঠে নেমে আসে এবং এই ভাবে আমাদের মিঠা পানির চাহিদাকে পূরণ করে। এই বৃষ্টির পানির সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং জীবের জন্য উপযুক্ত পরিমান মিঠাপানি বিভিন্ন নদীনালায় এবং ভূগর্ভে সংরক্ষণ করেন যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনে এই মিঠা পানিকে কাজে লাগাতে পারি। তাছাড়া পাহাড় থেকে নির্গত মিঠাঝরণা থেকেও নদীনালার সৃষ্টি হয়। পাথরের পাহাড় থেকে মিঠা পানির প্রবাহ মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের সীমাহীন কুদরতের নিদর্শন। এই সমস্ত নিদর্শনগুলির ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা গবেষনা করা উচিত। আমরা যদি গাফিলতির মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত করি তাহলে আল্লাহর কোনি নিদর্শনই আমাদের চোখে পড়বে না এবং সেই সমস্ত নিদর্শন ও নেয়ামতের সঠিকভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবো না। আল্লাহর নিদর্শনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা গবেষণা করলে আল্লাহর প্রতি ইমানি জজবা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি তার নেয়ামত আমাদের উপর আরও বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথ আরও সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ঘোষনা করেন —

"আর তখন তোমাদের রব ঘোষনা দিলেন 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের (নেয়ামত) বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন"। (সূরাহ্ ইব্রাহীম; আয়াত - ৭)

পবিত্র কুর্‌আনে ১০০ এরও বেশি আয়াত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তারা যেন চিন্তা ভাবনা করে শোনে, মনোযোগ দেয়, তুলনা করে বা পরিমাপ করে, গভীর ভাবে বুদ্ধি ও বিবেকের চর্চা করে এবং বিচার বিবেচনা করে।

পবিত্র কুর্‌আনের একাধিক আয়াত আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন তাঁর নিদর্শনের ব্যাপারে এইভাবে মানুষকে

প্রশ্নের সম্মুখিন করেছেন যে - 'তাদের অন্তর কী তালাবদ্ধ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখছো না? তোমরা কি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাচ্ছে না? তারা কি কুর্আন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?' যেমন সূরাহ মুহাম্মাদ এর ২৪ নং আয়াতে আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন বলেন —

''তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?''। (সূরাহ্ মুহাম্মাদ; আয়াত - ২৪)

এবার আমি মূল বিষয়ে এক গ্লাস পানি যে আল্লাহ তায়ালার কত বড় নিয়ামত তা আমরা অনুধাবন করি যখন গ্রীষ্মকালে কঠিন রৌদ্রের দিনে সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারের সময় এক গ্লাস শীতল পানি দিয়ে তখন রোজা ভঙ্গ করি। আল্লাহর তায়ালার এই নেয়ামতের শুকরিয়া সারা জীবন করেও তা যথেষ্ট হবে না। এই রকম ভাবে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নেয়ামত আমরা ভোগ করি কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যথার্থভাবে শুকরিয়া আদায় করি না। আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামে উল্লেখ করেছেন —

''তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখছ কি? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়া আন? না আমি বর্ষন করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না''। (সূরাহ্ ওয়াকিয়া; আয়াত - ৬৮-৭০)

আল্লাহ আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনার প্রত্যেকটা নেয়ামাতের যেন যথাযথভাবে শুকরিয়া আদায় করতে পারি তার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

খাদ্য উৎপাদনে পানি ঃ প্রাণীরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরী করতে পারে না। খাদ্যের ব্যাপারে প্রাণীরা উৎপাদক অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আর সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য পাণি হল এক অপরিহার্য উপাদান। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মাটি থেকে পানি শোষন করে সূর্যের আলোর সাহায্যে উদ্ভিদজগৎ তার ক্লোরোফিল যুক্ত সবুজ অঙ্গে (মূলতঃ পাতায়) এক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় (শর্করা) খাদ্য ও অক্সিজেন অনু তৈরী করে। এই খাদ্যের উপর নির্ভর করেই জীব প্রাণীর জীবনধারন চলে আসছে পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে। উদ্ভিদের পানির সাহায্যে এই খাদ্য তৈরীর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির নাম হল সালোকসংশ্লেষ বা ফোটোসিন্থেসিস। অর্থাৎ দেখলাম সালোকসংশ্লেষ পক্রিয়ার চারটি মূল উপাদানের (যথা জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সূর্যের আলো, ক্লোরোফিল) অন্যতম প্রধান উপাদানই হল পানি। পানি ছাড়া সালোকসংশ্লেষ সম্ভব নয়। সালোকসংশ্লেষ ছাড়া উদ্ভিদরাজ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, উদ্ভিদরাজ্যে ছাড়া প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ও কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। মহান আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন একটির সঙ্গে অন্য একটির যোগসাধনার মাধ্যমে সুনিপুনভাবে এই শষ্য শ্যমল পৃথিবীকে সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন উদ্ভিদের ফলমূল ও ফসল উৎপাদনের জন্য মেঘ সৃষ্টি করে আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে থাকেন পরিমান মতো। প্রয়োজন মত সেই পানিকে তিনি সংরক্ষণ করেন আবার অপসারণও করে থাকেন। এই সমস্ত বিষয়ে একমাত্র মতৃত্ব তাঁরই হাতে এবং এই ভাবেই তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে এই বিশ্বজগৎকে প্রতিপালন করে আসছেন আর এই কারণেই তিনি রব্বুল আলামীন অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রতিপালক এই ব্যাপারে রব্বুল আলামীন পবিত্র কুর্আনুল কারীমে ঘোষনা করেছেন —

''আমি আকাশ হতে পানি বর্ষন করে থাকি পরিমান মতো, অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি

তা অপসারণও করে থাকি। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমার তা থেকে আহার করে থাক"। (সূরাহ্ মুমিনুন; আয়াত - ১৮-১৯)

আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন —

"যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জানো"। (সূরাহ্ আল বাকারা; আয়াত - ২২)

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম মহান আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন প্রথমে পানি সৃষ্টি করে সেই পানি দিয়ে সমগ্র জীবজগতের খাদ্যউৎপাদনের সয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরী করে দিয়েছেন আর এটা একামত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং এই জন্যই তো তিনিই আমাদের রব এবং সারা জাহানের প্রতিপালক রব্বুল আলামীন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এখনও আমাদের প্রতিপালককে চিনতে পারলাম না। আমাদের চোখ থেকেও আমরা অন্ধ। বিবেক থাকলেও আমরা তা কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ। প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেকটা ধাপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞান অতঃপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। কে এই বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করে কাজে লাগালো? কে পানি সৃষ্টি করল? কে মেঘ সৃষ্টি করে পরিমিত বারি বর্ষণ করল। কে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করার কৌশল উদ্ভিদকে দান করল? কে ক্লোরোফিলের সৃষ্টি করল? কিছু মানুষ ভাবে এই সব প্রকৃতিক ঘটনা আপনা আপনি ঘটে। তাহলে আপনাদের বলি প্রাকৃতিক ঘটনা হলে একদিন ঘটবে দুদিন ঘটবে কিন্তু তৃতীয়দিন আর নিয়ম মাফিক বা সমস্ত নিয়ম মেনে ঘটবে না, উল্টোপাল্টা এলোমেলোভাবে আকস্মিক কখনও ঘটবে আবার কখনও ঘটবে না। প্রয়োজনে ঘটবে না আবার অপ্রয়োজনে ঘটবে। কখনও দ্রুত ঘটবে আবার কখনও মন্থরভাবে ঘটবে। কিন্তু আমরা দেখছি সালোকসংশ্লেষ পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে সূনিপুন ভাবে ঘটে চলেছে এবং সমগ্র জীবজগৎ এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী হওয়া খাদ্যের উপরই নির্ভর করে আদিকাল থেকে তার অস্তিত্ব পৃথিবীতে টিকিয়ে রেখেছে।

আফসোস সেই সব মানুষের জন্য যারা প্রতিপালকের অস্তিত্বের এত কিছু অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও তারা তাদের প্রতিপালককে চিনতে পারছে না। আল্লাহ আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং সেই সমস্ত মানুষদের হেদায়ত দান করুন। আমীন!

পানির রসায়নিক বিশ্লেষন ঃ পানি হল একটি অজৈব স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং বর্নহীন একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। দুটি হাইড্রোজেন পরমানু ও একটি অক্সিজেন পরমানুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক অনু পানি (H_2O) তৈরী হয় এবং পানির মধ্যে পানির অনুগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে একটির সঙ্গে আর একটি লেগে থাকে। আর এই হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণেই পানিকে আমরা তরল অবস্থায় পায়। পানির কঠিন অবস্থা হল বরফ এবং গ্যাসীয় অবস্থা হল জলীয় বাষ্প। পানি 0^oC এর বেশি 100^oC এর কম তাপমাত্রার মধ্যে তরল অবস্থায় থাকে। তাপমাত্রা 0^oC হলেই জমে বরফ হতে আরাম্ভ করে এবং তাপমাত্রা 100^oC হলেই ফুটতে শুরু করে, ফুটে জলীয় বাষ্পে

পরিণত হতে থাকে।

এ কথা এখানে বলতেই হয় যে পানিকে আল্লাহ্ তায়ালা কিছু আশ্চর্য ক্ষমতা দান করেছেন যা অন্য কোন তরল পদার্থকে দেওয়া হয় নি। আর এই কারণেই মনে হয় পানির এত গুরুত্ব এবং আল্লাহ্ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামতগুলির মধ্যে অন্যতম। যেমন -

■ পানির আনবিক ওজনের তুলনায় এর মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে। এই কারণে পানির তাপ ধারন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

■■ সাধারনত কোনো তরল পদার্থ জমে কঠিন হলে তার ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং আয়তন কমে যায়। কিন্তু পানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ পানি জমে বরফ হলে বরফের গাড়ত্ব পানির থেকে কমে যায় এবং বরফের আয়তন পানির থেকে বেশি হয়।

■■■ বরফের গাড়ত্বের তুলনায় পানির গাড়ত্ব বেশি হয় এবং ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির গাড়ত্ব সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। পানির এই গুরুত্বূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই শীতপ্রধান দেশে জলাশয়গুলি সম্পূর্ণ বরফে পরিনত হয় না। জলাশয়ের উপরি মোটা বরফের আস্তারণ থাকে কিন্তু নীচের পানি বরফ হতে পারে না। ফলে জলজ প্রাণিরা বেঁচে থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালা পানিকে এই অলৌকিক ক্ষমতা দেওযার ফলে এটি সম্ভব, না হলে শীতকালে সমস্ত জলজ প্রাণিরা মৃত্যুবরণ করত।

আল্লাহ তায়ালা পানিকে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দান করেছেন। সেটা হল পানি অনেক পদার্থকে নিজের মধ্যে দ্রবিভূত করতে পারে। এই ধর্মটা পানিকে অন্যান্য তরল থেকে অনন্য করে তুলেছে আর এই কারণে বিজ্ঞানীরা পানিকে ''সার্বজনীন দ্রাবক'' হিসাবে অভিহিত করেছেন।

পৃথিবীতে অন্য কোনো তরল পদার্থকে দেওয়া হয়নি যেটা পানিকে দেওয়া হয়েছে আর তা হল পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।

মানব শরীরে পানি ঃ আগেই উল্লেখ করেছি মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন প্রত্যেকটা জীবনকে তিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

''**প্রানবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম**''। (সূরাহ্ আম্বিয়া; আয়াত - ৩০)

''**আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে**''। (সূরাহ্ নূর; আয়াত - ৪৫)

''**তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন**''। (সূরাহ্ আলফয়রকান; আয়াত নং - ৫৪)

এই আয়াতপাক গুলি থেকে এটি সষ্ট যে পানিকে আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেকটা জীবন্ত প্রাণির উপাদানের মূল উৎস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা বলেছেন কোষীয় প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৮০ শতাংশই পানি। আর মানব শরীরে ওজন অনুযায়ী শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পানি থেকে। মানব শরীরে অনবরত যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ঘটে চলেছে যার জন্য আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি তা একমাত্র পানির জন্যই সম্ভব হয়েছে।

মানব শরীরে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। মানব শরীরে পানির ভারসাম্য বা সমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। কোনো কারণে আমাদের শরীর পানির অভাব বা আধিক্য ঘটলে আমাদের আকস্মিক

ও দীর্ঘমেয়াদী অনেক জটিল জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। উল্লেখ্য, মানব শরীরে ১% পানি শূণ্যতা দেখা দিলে তখন সে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। পানি শূন্যতা ৫% হলে জিহ্বা ও মুখের ভিতর শুষ্ক হয়ে যায় এবং খুব দুর্বলতা অনুভূত হয় আর পানি শূণ্যতা ১০% হলে ইমার্জেন্সি অবস্থার সৃষ্টি হয়, সঠিক চিকিৎসা পরিসেবা না পাওয়া গেলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

মানব শরীরে পানির অভাবে সৃষ্টি হওয়া রোগ সমূহ ঃ একজন মানুষ তার ওজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় জলপান না করলে বিভিন্ন জটিল রোগ দেখা দিতে পারে তার শরীরে। য়েমন —

১। পানি আমাদের শরীরে খাদ্য হজম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। কাজেই আমাদের পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী রাখার জন্য ওজন অনুযায়ী দৈহিক নির্দিষ্ট মাত্রার পানি পান করা অত্যন্ত জরুরী।

২। পর্যাপ্ত পানি পরিমান অনুযায়ী পান করতে পারলে শরীরের সঠিক ওজন বজায় থাকে। যাদের শরীরে অতিরিক্ত ওজন রয়েছে তাদের ওজন হ্রাস ঘটে কারণ পানি বিপাকের হার বৃদ্ধি করে।

৩। পানি শরীরের অতিরিক্ত ক্যালোরী ক্ষয় হতে সাহায্য করে। ফলে ওজন হ্রাস পায় যাদের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে।

৪। পর্যাপ্ত জলপান না করলে পেশিশক্তি হ্রাস পায় কারণ শরীরে তরলের ভারসাম্য রক্ষায় ঘাটতি হয়। ফলে সারাদিন ক্লান্তিভাব আমাদের শরীরে অনুভূত হয়।

৫। খাবার খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে পানি পান করলে ক্ষুধামন্দা দূর হয়।

৬। আমাদের শরীরে উৎপন্ন হওয়া ক্ষতিকারক পদার্থগুলি যেমন ইউরিয়া, ক্রিটিনিনকে কিডনী ছেঁকে রক্তকে বিশুদ্ধ করে। ক্ষতিকারক পদার্থগুলি মূত্রের মাধ্যমে আমাদের শরীরের বাইরে বের হয়ে যায়। এখানে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭। পর্যাপ্ত পানি পান করলে ত্বক উজ্জল থাকে। ব্রণ, ফুসকুড়ি ইত্যাদি ত্বকের নানা সমস্যার পানিই হল একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী সমাধান।

৮। মানসিক দিক থেকেও জল অত্যন্ত জরুরী। মস্তিষ্কের জল সরবরাহের ঘাটতি হলে ডিহাইড্রেশনের মতো মারাত্মক সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে।

৯। ওজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় জলপান না করলে কিডনি স্টোন তেরী হয় যার ফলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে।

১০। পর্যাপ্ত পানি পানের অভাবে গলস্টোন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে।

পানি পানের সঠিক পরিমান ঃ আমরা বার বার একটা কথা বলছি যে ওজন অনুযায়ী সঠিক পানি পান করতে হবে। কাজেই যে বিষয়টা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমাদের সারাদিনে কি পরিমান পানি পান করতে হবে? সারাদিনে কতটুকু পানি পান করতে হবে তা কিন্তু সকলের জন্য সমান নয়। পানি পানের সঠিক পারিমাপ হল — শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রতি ২০ কেজিতে দৈনিক ১ লিটার পানি পান করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ কারও ওজন ৮০ কেজি হলে তাকে দৈহিক ৪ লিটার পানি পান করতে হবে। আবার কারও ওজন ৫০ কেজি হলে তাকে দৈনিক ২.৫ লিটার ও কারও ওজন ৬০ কেজি হলে তাকে দৈনিক ৩ লিটার

পানি পান করতে হবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে সঠিক পরিমানে পানি পান করা যেমন জরুরী তেমনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করলে তা আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান ঃ আমরা যদি আমাদের শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান করি তাহলে সেটি হবে আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতিরিক্ত পানি পান করলে আমাদের শরীরের ইলেকট্রোলাইটগুলি পাতলা হয়ে যায়, ফলে শরীরে সোডিয়ামের পরিমান হ্রাস পায় এতে দুর্বলতা, খিচুনী ও অজ্ঞান হয়ে পড়ার মতো সমস্যা তৈরী হয়। অতিরিক্ত পানি পানে ক্লান্তি ও মাথা ব্যাথার মতোও সমস্যা তৈরী হতে পারে। এছাড়া বার বার প্রসাবের বেগ আসে, ব্যাস্ততার কারণে প্রসাবের বেগ চেপে রাখলে কিডনীর উপর চাপ সৃষ্টি হয় যেটি ভবিষ্যতের পক্ষে কিডনী বিকল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী করে। এছাড়া অনেক সময় শরীর অতিরিক্ত পানি ধরে রাখে যা ওজন বৃদ্ধি করে যেটি উচ্চ রক্তচাপ ও সুগার রোগকে আমন্ত্রন জানিয়ে দেয় কিছুদিনের মধ্যে শরীরে এসে বাসা বাঁধার জন্য।

পানি পান করার যথার্থ সময় ঃ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোন সময় পানি পান করা যথার্থ হবে? রাতের বেলা না দিনের বেলায়? অনেকে আমরা দিনের বেলায় ব্যস্ততার কারণে পানি কম পরিমানে পান করি কিন্তু রাতের বেলায় একটু বেশি পরিমানে পানি পান করে ফেলি। যেটি আমাদের শরীরের পক্ষে নানাবিধ ক্ষতির কারন হতে পারে। যেমন প্রথমত রাতের বেলায় বেশি পানি পান করার ফলে বার বার প্রসাবের বেগ আসবে যেটি আমাদের মূল্যবান ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে আবার অন্যদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার ফলে প্রসাবের বেগ অনুভূত হবে না। ফলে কিডনীর উপর একটা চাপ সৃষ্টি হবে যেটি ভবিষ্যতে কিডনি বিকল হওয়ার সম্ভাবনাকে আমন্ত্রন জানাতে পারে। দ্বিতীয়ত রাত্রের বেলায় অল্প পানি পান করে আমাদের শরীরের মূল্যবান অঙ্গ কিডনিকে বিশ্রাম দিতে হবে। কিন্তু যদি আমরা বেশি পরিমানে পানি পান করে ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে আমরা বিশ্রাম করলেও কিডনিকে আর বিশ্রাম দেওয়া হলো না। এই ভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে কিন্তু কিডনি লাইফ কমে যেতে পারে। তাই আমাদের এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই জরুরী হল আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় পানির অধিকাংশই দিনের বেলা পান করতে হবে এবং রাত্রে খুব অল্প পরিমানে পানি পান করতে হবে এবং ঘুমাতে যাওয়ার কমপক্ষে একঘন্টা আগে পানি পান করা শেষ করতে হবে।

ভারী খাবার পর পানি পান করা উচিৎ কিনা ঃ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের শরীরের পক্ষে। অনেকে আমরা ভাত খাওয়ার পর পরই পুরো একগ্লাস পানি পান করে ফেলি অথবা ভাত খাওয়ার মাঝে মাঝে পানি পান করেতে থাকি যেটা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ হল আমরা যখন কোনো খাবার খাই সেটিকে হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলী গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত করে। এখন খাবার পর পরই পানি পান করলে পানি এই মূল্যবান গ্যাস্ট্রিক রসকে লঘু করে দেয় ফলে এটির কার্যক্ষমতা অনেক কমে যায়। যার জন্য খাবার আর ঠিকঠাক হজম হয় না, গ্যাস, অম্বল, বুকজ্বালা ইত্যাদি রোগ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। খাবার ঠিকঠাক হজম না হলে এতে দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলেরও ঘাটতি হতে পারে এতে আমাদের নানা রকম দীর্ঘ মেয়াদি জটিল জটিল রোগের উৎপত্তি হতে পারে। এছাড়াও খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক রসের পাশাপাশি প্যথক্রিয়াস থেকেও বিভিন্ন এনজাইম ক্ষরিত হয়। ভাত খাওযার পরপরই পানি পান করলে এই সমস্ত এনজাইম

গুলিও আর ভালোভাবে কাজ করতে পারে না ফলে হজমের একটা ব্যাঘাত কিন্তু সৃষ্টি হয়েই যায়। তাই বিজ্ঞানসম্মত হল ভাত খাওয়ার ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর পানি পান করা।

অবশ্য এখানে বলে রাখি খাবার খাওয়ার সময় পানি সাথে রাখতে হবে যদি কোনো কারণে গলায় আঁটকায় তাহলে অল্প পানি পান করতে হবে।

পানি পান করার আদব ঃ কীভাবে পানি পান করতে হবে, সে তরিকা রসুলুল্লাহহ (সঃ) আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। পানি পান করার সুন্নাত পদ্ধতিগুলি যদি আমরা বিশ্লেষন করি তাহলে দেখা যাবে প্রত্যাকটা পদ্ধতিই হল চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত এবং প্রত্যেকের মধ্যেই আমাদের শরীরের উপকারিতা লুকিয়ে আছে।

পানি পান করার সুন্নাত সমূহ ঃ

১। ডান হাতে পানি পান করা। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে পানি পান করে (সহীহ মুসলিম)

২। বসে পানি পান করা, দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ। (সহীহ মুসলিম)

৩। পানি পান 'বিসমিল্লাহ' পড়ে শুরু করা। (সুনানে তিরমিযী)

৪। পানি পানের শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করা (সুনানে তিরমিযী)

৫। তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা, নিঃশ্বাস ফেলার সময় গ্লাস থেকে মুখ আলাদা করা (সহীহ মুসলিম)

এখানে বলে রাখি আমরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইখ গ্যাস ত্যাগ করি যেটি আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এটি হল আমাদের শরীরের বর্জ্য। এখন পানি পান করতে করতে যদি আমরা পান পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তাহলে পানির সঙ্গে এই দূষিত গ্যাস মিশ্রিত হয়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করবে যেটি আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগের জন্ম দেবে। পাঠক একবার ভেবে দেখুন আজ থেকে কিছু কমবেশি ১৪৪০ বছর আগে রসুলল্লাহ্ (সঃ) এই বিজ্ঞান আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অথচ মানুষ তখন এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কথা জানতই না।

৬। গ্লাসের ভাঙা অংশের দিক দিয়ে পানি পান না করা। (সুনানে আবু দাউদ)

৭। জগ ইত্যাদি বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান না করা কেননা এতে বেশি পানি চলে আসার বা সাপ-বিচ্ছু থাকার সম্ভাবনা থাকে। (বুখারী, মুসলীম)

৮। ওজু করার পর যে পাত্রে হাত দিয়ে পানি নেওয়া হয়, সে পাত্রের অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা। এতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয়। (বুখারী শরীফ)

৯। পানীয় দ্রব্য পান করে কাউকে দিতে হলে ডান দিকের ব্যক্তিকে আগে দেওয়া এবং এই ধারাবাহিকতা অনুয়ায়ীই শেষ করা। (বুখারী শরীফ)

রসুলুল্লাহ্ (সঃ) পানি পান করার যে পদ্ধতি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো শুধু সুন্নাতই নয়, সুন্নাত তো অবশ্যই বরং এর পাশাপাশি এর প্রতিটিতে রয়েছে শরীর সুস্থ রাখার নিদর্শন।

রসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন —

''তোমরা পানির পাত্রকে ঢেকে রাখো এবং বাসনগুলিকে উল্টো করে রাখো''। (মুসলীম শরীফ)

পানির বিশুদ্ধতা পরিমাপের মাপকাঠি ঃ আমরা যে পানি পান করি তা সাধারণত ভূগর্ভস্থ থেকে উত্তোলন করা

হয়। ভূগর্ভের মধ্যে পানি সঞ্চিত থাকার সময় মৃত্তিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পানির মধ্যে বিভিন্ন খনিজ পদার্থগুলি মিশে থাকে। খনিজ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়রন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, বাই কার্বনেট, ক্লোরাইড, ফ্লুরাইড, আর্সেনিক, লেড, ইত্যাদি। এই খনিজগুলি পানির মধ্যে গুলে থাকে। এই খনিজ গুলিকে খালি চোখে দেখা তো যায়ই না এমনকি সাধারণ কোন ছাকুনির সাহায্যে এদেরকে পৃথক করাও যায় না। পানির মধ্যে গুলে থাকা এই খনিজগুলির পরিমান এর একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যে সীমার বাইরে গেলে সেই পানি আমাদের আর পানের যোগ্য থাকে না। যে সূচকের সাহায্যে পানির মধ্যে গুলে থাকা খনিজ গুলির পরিমাণকে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় টি.ডি.এস.(Total Dissolve Solids)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সমীক্ষা অনুসারে, প্রতি লিটারে টি.ডি.এস-এর সর্বাধিক মাত্রা ৩০০ পি.পি.এম যেখানে বিস (BIS) এর সমীক্ষা অনুসারে টি.ডি.এস-এর সর্বাধিক মান ৫০০ পি.পি.এম।

বিশুদ্ধ পানির টিডিএস মাত্রা ঃ

১০০ থেকে ২৫০ পি.পি.এম	পান করার জন্য সবথেকে আদর্শ
২৫০ থেকে ৫০০ পি.পি.এম	পান করা নিরাপদ
৫০০ থেকে ৭০০ পি.পি.এম	পানের জন্য উপযুক্ত নয়
৭০০ থেকে ১২০০ পি.পি.এম	পানির মান অত্যন্ত খারাপ
১২০০ পি.পি.এম-এর অধিক	একেবারেই পানের অযোগ্য
০ থেকে ৫০ পি.পি.এম	পান করলে ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে

দেখা গিয়েছে যে, প্রতি লিটারে টি.ডি.এস-এর মাত্রা ১০০ মিলিগ্রামের কম হলে শরীরের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খনিজগুলো পরিশুদ্ধ জলে প্রায় থাকেই না।

ফলে খনিজ ঘাটতি, তৃষ্ণা বৃদ্ধি এবং শিশুদের বিকাশজনিত সমস্যা সহ নেতিবাচক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। এটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং পরিবেশের লোকেদের জন্যও ক্ষতিকারক হতে পারে।

বিশুদ্ধ পানির টিডিএস মাত্রা ঃ এছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হল আমরা যে পানি পান করব সেই পানির পি.এইচ কত সেটি আমাদের জানতে হবে। সাধারনত বিশুদ্ধ পানির পি.এইচ এর মান ৭ হলে সেই পানি পানের পক্ষে আদর্শ। এছাড়া বিশুদ্ধ পানির পি.এইচ এর মান ৬.৫ থেকে ৮.৫ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশুদ্ধ পানির পি.এইচ-এর মান এই সীমার বাইরে গেলে তা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। পি.এইচ এর মান ৭ এর কম হলে সেই পানির চরিত্র কিছুটা আম্লিক এবং পি.এইচ এর মান ৭ এর বেশি হলে সেই পানির চরিত্র কিছুটা ক্ষারীয় প্রকৃতির হবে। যাদের বুক জ্বালা এসিডিটির সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই পানি পান করা উপকারী হবে যে পানির পি.এইচ এর মান ৭ থেকে ৮.৫ এই সীমার মধ্যে থাকবে।

কাজেই ওপরে আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ততে আসতে পারি যে আদর্শ পানির টি.ডি.এস এর মান হতে হবে ১০০ থেকে ২৫০ এর মধ্যে এবং পি.এইচ হতে হবে ৭।

পরিশুদ্ধ পানি পেতে Water Purifer এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

বর্তমানে পানিকে নিয়ে চলছে বাজারের রমরমা ব্যবসা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পানিকে তাদের লাভজনক

ব্যবসায়িক পন্যে পরিনত করেছে। টিভির পর্দায় কিংবা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন কোম্পানীর ওয়াটার পিউরিফায়ারের বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাদের বাড়িতের ওয়াটার পিউরিফায়ার ইনস্টল করে নিচ্ছে এবং নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে যে তারা বিশুদ্ধ পানি পান করছে। চিন্তাভাবনা না করে ওয়াটার পিউরিফায়ার বাড়িতে ইনস্টল করলে তারা যেমন নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মকেও কেটি হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। এই সমস্ত ওয়াটার ইউরিফায়ারে যে শক্তিশালী ফিল্টরেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তার নাম হলো RO WATER PURIFIER. RO means REVERSE OSMOSIS.

তবে বিশুদ্ধ পানি পেতে গেলে অবশ্যই ওয়াটার পিউরিফায়ারের প্রয়োজনীয়তা আছে। ফিল্টার করা পানি আপনার দেহকে নানা রোগ জীবানুর হাত থেকে নিরাপদ রাখে। ডাক্তাররাও ফিল্টার করা পানি পান করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। আমারও সাজেশন হল অবশ্যই ফিল্টার করে পানি পান করুন। তবে আপনার কোন ধরনের ওয়াটার পিউরিফায়ারের প্রয়োজন তা নির্ভর করবে আপনার পানির টি.ডি.এস এর মাত্রার ওপর। আপনার বাড়িতে ওয়াটার পিউরিফায়ার ইনস্টল করার আগে অবশ্যই আপনার বাড়ির ব্যবহার করা পানির টি.ডি.এস পরিমাপ করে তবেই ফিল্টার নির্বাচন করবেন। না হলে হিতে বিপরীত হবে অর্থাৎ ভালো করতে গিয়ে খারাপ করে বসবেন। প্রধান প্রধান ফিল্টার এবং কোন টি.ডি.এস এ কোন কোন ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত তার সম্পর্কে একটু বলে রাখি।

১। Reverse Osmosis (RO). RO ফিল্টার পানির টি.ডি.এস ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।

২। Nano Filtration (NF). NF ফিল্টার পানির টি.ডি.এস ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।

৩। ULTRA VIOLET RAY (UV RAY) : পানির মধ্যে থাকা ভাইরাস ব্যালটেরিয়া সহ সমস্ত ক্ষতিকারক বস্তুগুলিকে ডিএক্টিভেট করতে সক্ষম। কিন্তু পানির টি.ডি.এস এর উপর এই ফিল্টারের কোন প্রভাব নেই।

৪। ULTRA FILTRATION (UF) : UF FILTER দ্বারা ডিএক্টিভেট করা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ফিল্টার করে পরিশুদ্ধ পানি দেওয়া এই ফিল্টারের কাজ।

RO + UV + UF WATER PURIFIER : পানির টি.ডি.এস ১২০০ এর অধিক হলে তবেই।

NF + UV + UF WATER PURIFIER : পানির টি.ডি.এস ৭০০ থেকে ১২০০ এর মধ্যে।

ONLY UV + UF WATER PURIFIER : পানির টি.ডি.এস ১০০ থেকে ৫০০ এর মধ্যে।

জমজম পানির রাসায়নিক বিশ্লেষন ঃ

জমজমের পানি সর্বোত্তম পানি ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, 'জমিনের বুকে জমজমের পানি সর্ব্বোত্তম পানি। (আল হাদিস)

জমজমের পানিতে আছে খাদ্যের উপাদান ঃ রাসুল (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তা বরকতময়, আর খাবারের উপাদানসমৃদ্ধ (আল হাদিস)

জমজমের পানি বরকতময় ঃ আবু জর গিফারি (রাঃ) বলেন রাসুল (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তা বরকতময়। (আল হাদিস)

রোগের শিফা ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত রাসুল (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তা সুখাদ্য খাবার এবং রোগের

শিফা (আল হাদিস)

জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবেন তা পূর্ণ হয় ঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, 'জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা সাধিত হবে। (আল হাদিস)।

জমজম পানি সম্পর্কিত উপরের হাদিস পাক গুলি বর্তমানে বিজ্ঞানীরা হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

জমজম পানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, বাই কার্বনেট, ক্লোরাইড বর্তমান। আদর্শ পানির মধ্যে খনিজ গুলির পরিমাণ যেমন থাকা দরকার জমজম পানির মধ্যেও খনিজ গুলি ঠিক সেই সেই পরিমাণে রয়েছে। আর এই কারণেই জমজম কূপের পানি বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে অতি উচ্চস্থানে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রমান পেয়েছে যে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া পানির মধ্যে জমজম কূপের পানি হল পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে উৎকৃষ্ট।

এই পানির মধ্যে বিপদ সীমার নিচে ফ্লোরাইডের উপস্থিতি এই পানিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জীবানুনাশক করে তুলেছে। এই কারণেই এই পানির মধ্যে কোনরকম ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক জন্মাতে পারে না। বোতলের মধ্যে দীর্ঘদিন এই পানি থাকলেও এই পানির কোনরকম পরিবর্তন হয় না আর এই কারনেই একে ব্যবহার করা যায়। এটি আল্লাহপাক রব্বুল আলামীনের কুদরতি ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জমজম পানির পি.এইচ হল ৭.৮, অর্থাৎ জমজম কূপের পানির রাসায়নিক গঠন কিছুটা অ্যালকালাইন প্রকৃতির, যা শরীরের অতিরিক্ত এসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। গ্যাসটিক, আলসার ও হৃদযন্ত্রে বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই এই পানি খুদা নিবারণ করে হজম ক্ষমতা বাড়ায়, চোখের ব্যাধি দূর করে, এসিডিটি গ্যাসটিক আলসারসহ বিভিন্ন রোগের শিফা হিসাবে কাজ করে।

আসলে জমজম কূপ হল মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য রহমত স্বরূপ আর এই কারণেই এই পানি এত বরকতময়।

পাখির ধর্ম

জায়দুল মল্লিক

অষ্টম শ্রেণী

আমায় ভালো লাগে না বন্দীত্ব
তার মধ্যে নেই আমি সন্তুষ্ট।
এই খাঁচায় আমি নেই ভালো,
সেটা হোক না স্বর্ণ।
আমার মন আমি যেথায় ঘুরবো,
সেখানে খাবো সেখানে উড়বো।
গান গাই আমি মধুর সুরে,
নিজের মনে উড়ে উড়ে।

ফাজিলে প্রথম স্থানাধিকারীকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা

২০১০ সালে নির্মীয়মান মাদ্রাসা ভবন

জেলা ক্রীড়ায় সফল প্রতিযোগিরা

মহকুমা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফল ছাত্ররা

নতুন হোস্টেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

সায়েন্স ল্যাবরেটরী

নবাবী আমলের ৪০ ফুটের দলিল প্রদর্শন

মাদ্রাসার লাইব্রেরী

নতুন মাদ্রাসা ভবনের প্রবেশ দ্বার

পুরাতন মাদ্রাসা ভবন

ঐতিহাসিক ইণ্ডাওমেন্ট শাহী মসজিদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত নতুন হোস্টেল ভবন